ডলারের খেলা ও রাষ্ট্রের দেউলিয়াত্বের রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী

কখনো ভেবে দেখেছেন, কেন একের পর এক দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে? ডলার কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে? আর কেনইবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন বলেছিলেন,

"আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থা।"

রাজনৈতিক শোষণের মতো অর্থনৈতিক শোষণও একটি বাস্তবতা। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা যারপরনাই উদাসীন। অথচ আমরা চাল কিনি কিংবা চিনি, এর পিছনে আছে অর্থনীতি; সোনা-রুপায় লেনদেন করি কিংবা কাগজ-কার্ডে লেনদেন করি, এর পিছনেও রয়েছে অর্থনীতি। অর্থনীতির এই অজানা জগতকে পাঠকদের সামনে উন্মুক্ত করতে সহজ সরল বাংলায় ও গল্পে গল্পে লেখা হয়েছে 'ডলারের খেলা ও রাষ্ট্রের দেউলিয়াত্বের রহস্য' বইটি।

মূল্য : টাকা ৪২০.০০
Price : Taka 420.00 | US$ 8.00

ডলারের খেলা ও রাষ্ট্রের দেউলিয়াত্বের রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী

সম্পাদনা
আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মিনহাজ রেজা

ঐতিহ্য

ডলারের খেলা ও রাষ্ট্রের দেউলিয়াত্বের রহস্য
মোহাইমিন পাটোয়ারী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৯
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

DOLARER KHELA O RASTRER DEWLEYATTER ROHOSYO
by Mohimen Patowary
Published by Oitijjhya
Date of Publicationt February 2023

E-mail: oitijjhya@gmail.com

ISBN 978-984-776-123-7

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি এবং অগণিত দরুদ ও সালাম শেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

আপনি গোয়েন্দা কাহিনি পড়তে পছন্দ করেন? কিংবা ধাঁধা সমাধান করতে? কয়েকটা প্রশ্ন করি,

১. মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল ব্রিটিশদের?
২. মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা ছিল ব্রিটিশ পাউন্ড?
৩. মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর মহাযুদ্ধ জিতেছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার?

আরেকটা প্রশ্ন করি, মনে করেন একটা গ্রামে একটা বড় মাতবর আছে; সে বিশাল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী ও দীর্ঘদিন ধরে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শক্তভাবে এলাকায় ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এবার সেই গ্রামে যদি নতুন কোনো মাতবর আসে ও ছড়ি ঘোরাতে চায়, তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে? তারা কি বন্ধু হবে, নাকি শত্রু? তারা এতটাই শত্রু হবে যে একে-অপরকে মেরেই ফেলতে চাইবে, তাই না?

ব্রিটিশরা দুনিয়া শাসন করেছে কত বছর? প্রায় ২০০ বছর বা তারও বেশি, তাই না? ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যে তো সূর্য অস্ত যেত না। এর মাঝে কী এমন ঘটল যে মাত্র ১০০ বছরে ব্রিটিশরা পিছিয়ে গেল আর আমেরিকানরা পুরো দুনিয়া পেয়ে গেল কোনো যুদ্ধবিগ্রহ-মারামারি-কাটাকাটি ছাড়াই? ফ্রান্স এখনো তার কলোনি করা দেশগুলোরে ছেড়ে দেয়নি, ১৪টা আফ্রিকান দেশে ফ্রান্সের প্রচ্ছন্ন হুকুমত চলে। তাহলে ব্রিটিশরা কেন পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরে গেল?

এমন যদি হতো যে ব্রিটিশরা বড় ভাই আর আমেরিকানরা ব্রিটিশদের পিছে পিছে ঘোরে, এমনও তো নয়। ব্রিটিশরা কোনো যুদ্ধেও হারেনি, কোনো বিশ্বযুদ্ধেও হারেনি, উপমহাদেশ কিংবা কোনো কলোনি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, কিছুই না। তাহলে তারা কেন আমেরিকানদের হাতে দুনিয়া দিয়ে চুপচাপ নিজের দেশে বসে গেল?

আচ্ছা, আমেরিকানরাও দুনিয়া পেল কোথায়? তারা তো কোনো দেশকে কলোনি করেনি। সকল দেশ স্বাধীন। দুনিয়াতে ১৯০টার বেশি স্বাধীন দেশ। তাহলে এত ক্ষমতা এল কোথা থেকে আমেরিকার কাছে?

জি, ঠিক ধরেছেন...আমেরিকার ক্ষমতা এসেছে 'অর্থনীতি' থেকে। এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে কয়েকটা মূলনীতির চরমপন্থি বাস্তবায়ন...

১. সকল মুদ্রা তৈরি হবে সুদভিত্তিক উপায়ে আর এটা নিশ্চিত করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
২. সকল লেনদেন হবে সুদভিত্তিক আর এটা নিশ্চিত করবে বাণিজ্যিক ব্যাংক।
৩. সকল অর্থনীতি হবে সুদভিত্তিক আর এটা নিশ্চিত করবে আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থা (লিগ অব নেশনস, জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউটিও ইত্যাদি)

কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হলে আপনার ভেতরে নানান উপসর্গ দেখা যায়। আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে, জ্বর আসতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে, কাশি হতে পারে। শ্বাসকষ্টের সাথে কোভিড ভাইরাসের সম্পর্ক কী? কোভিড ভাইরাস আপনার ফুসফুসে আক্রমণ করে এবং এর ফলে আপনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারেন না। তাহলে আপনার দেশ দেউলিয়া হওয়ার সাথে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক কী?

খুব সহজ।

১. কোনো দেশের সরকার নিজেদের মুদ্রা নিজেরাই তৈরি করলে দেশের ভেতরে কাজ করার জন্য যে টাকা লাগে, সেটার ওপর কোনো সুদ দেওয়া লাগে না, ফলে ঋণ তৈরি হয় না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় টাকা ছাপিয়ে সরকার ঋণ নিলে সেটা সব সময় সরকারের ওপর বোঝা হয়ে থাকবে। সুতরাং রাষ্ট্র দেউলিয়া হতে এক ধাপ এগিয়ে গেল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকে আসা শুরু করল।
২. সকল লেনদেন যদি সার্ভিস চার্জভিত্তিক হয়, তাহলে তো সিম্পল, সবাই জিতল। কিন্তু সুদভিত্তিক হলে সকল সম্পদ ব্যাংকের দিকে আসা শুরু করবে। সেটা দেশি ব্যাংক হোক কিংবা বিদেশি ব্যাংক। আর পুরো দেশ ঋণে জর্জরিত থাকবে।
৩. অর্থনীতি সুদভিত্তিক হলে সেটা আমেরিকার সকল নীতির সাথে এক মত পোষণ করবে। খেয়াল করে দেখতে পারেন, আমাদের দেশের সিংহভাগ অর্থনীতিবিদ নর্থ আমেরিকায় পিএইচডি করা। সুতরাং, তারা পলিসিতে পশ্চিমা ফিলোসফি সমর্থন করবে, এটাই স্বাভাবিক। এজন্য এসব অর্থনীতিবিদ যেসব দেশ থেকে আসেন, সেসব দেশের সকল অর্থনৈতিক কাঠামো পশ্চিমা নীতিতে তৈরি। রাশিয়া, চীন ও আরবের অর্থনীতিও

এখন পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি। তবে এসব দেশ থেকে পড়াশোনা করা অর্থনীতিবিদেরা কিন্তু একই রকম মোসাহেবি আচরণ করে না বা পশ্চিমা অর্থনৈতিক দর্শনকে অন্ধভাবে সমর্থন করে না। কারণ, তারা আলাদা অর্থনৈতিক দর্শন ধারণ করে।

৪. সকল তালার নিজস্ব একটা চাবি থাকে আর একটা মাস্টার চাবি থাকে, যা দিয়ে একই প্রকারের সকল তালা খোলা যায়। নতুন দিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংককেন্দ্রিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাস্টার চাবি হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মুদ্রা 'ডলার'। এজন্য ডলারকে করা হয়েছে সকল আন্তর্জাতিক লেনদেনের কেন্দ্র।

গত ১০০ বছরের ওপরের ৪টা ব্যাপার বাস্তবায়নে আমেরিকা সফল। এত সাফল্য পাবে সে, এটা হয়তো সে-ও ভাবতে পারেনি কিংবা শুরুতে এত এত পরিকল্পনা করে নামতেও পারেনি। কিন্তু আমেরিকা দুনিয়াতে ছড়ি ঘোরানোর জন্য বেছে নিয়েছে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং বছরের পর বছর সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা প্রয়োজন, সেগুলো গঠন ও বাস্তবায়ন করে গিয়েছে। এখন আমরা সেগুলোর ফল দেখতে পাচ্ছি। তাই কোনো দেশকে কলোনি করা লাগেনি আমেরিকার। তেলের জন্য ডজনখানেক দেশে যুদ্ধ করা লাগলেও একের পর এক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পাঠাতে হয়নি সৈন্য। জনতাকে শোষণ করছে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংককে শোষণ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সম্পদ ট্রান্সফার করছে ডলার। বাংলাদেশের আমির আলীর সুদ মেটাতে গাছ বিক্রির টাকা জাদুবলে সোনা হয়ে জমছে ফেডারেল রিজার্ভে, এটাই আমেরিকান ড্রিম।

বিশ্বের প্রতিটা দেশ অর্থনৈতিকভাবে ডলারের কাছে জিম্মি। স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক এই পরাধীনতাই নিশ্চিত করেছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের ছড়ানো সুদভিত্তিক ঋণতান্ত্রিক দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য বৃদ্ধিকারী মুদ্রাব্যবস্থা। মোহাইমিন পাটোয়ারী ভাই সেই ডলারের খেলা আর অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন দেশের দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কিংবা দেউলিয়া হলে কী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটার নানান দিক সুন্দরভাবে উঠিয়ে এনেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

উজ্জীবিত তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক মোহাইমিন ভাই অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই সব আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার পরতে পরতে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের এমন কিছু উক্তি সংগ্রহ করেছেন, যা পাঠকদের বিস্মিত করতে বাধ্য। যেমন আড়াই শো বছর আগের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের উক্তিটি, 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা।'

অথচ জেফারসন যেটাকে ভয় পেয়েছিলেন, পরের প্রজন্মের আমেরিকানরা সেটাকে অস্ত্র বানিয়েছে, সেটা কি বুঝতে কারও বাকি আছে?

ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মেয়ার রথসচাইল্ডের এই উক্তিটি দেখুন, 'যে সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল, আমার তাতে কিছু যায়-আসে না। কারণ, যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।'

পুরো বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' একটা প্রাইভেট সংস্থা। অর্থাৎ গুটি কয়েক ব্যক্তি এই ফেডারেল রিজার্ভের মালিক। তাহলে পুরো বিশ্বের সকল সম্পদ কার বা কাদের হাতে ঢুকছে? বর্তমানের এই নতুন দিনের নাথান মেয়ার রথসচাইল্ড কে? আপনি কি তাদের কাউকে চেনেন? না, চেনেন না। এটাই তো বাস্তবতা...

পুরো বিশ্বকেই এখন রথসচাইল্ডের ভূত আর জেফারসনের সেই ভয় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে...

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মিনহাজ রেজা
উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক

সূচিপত্র

দেউলিয়াত্ব কী?

'একটি দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে'–এই কথাটি শুনলে প্রথমে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, দেশ কীভাবে দেউলিয়া হয়? এর পরপরই আরও একগাদা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে থাকে... দেউলিয়াত্বের অর্থনৈতিক ফলাফল কী? এর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উপায় কী? দেশ দেউলিয়া হলে আমাদের সবার কী হবে ইত্যাদি। আপনার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই চলুন, বিষয়গুলো বুঝতে একেবারে শূন্য থেকে আজকের আলোচনা শুরু করা যাক।

খুব সোজা বাংলায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণ নেওয়ার পর যখন ঋণের দায় পরিশোধ করতে পারে না, তখন সে দেউলিয়া হয়ে যায়। সাধারণত, এমতাবস্থায় ঋণ প্রদানকারী কোর্টে গিয়ে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। কোর্ট তখন সব কাগজপত্র খতিয়ে দেখে রায় দেয় যে, 'এই ব্যক্তির পক্ষে ঋণের দায় পরিশোধ করা সম্ভব না; সে দেউলিয়া হয়ে গেছে।' তবে ঋণগ্রহীতা চাইলে কোর্টে গিয়ে নিজেও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে। ধরি, পিরোজপুরের রতন মিয়ার 'রতন'স দেশি শুজ' নামে ২০ লাখ টাকা মূলধনের একটা জুতার কারখানা আছে। সুযোগ বুঝে সে নামকরা নালন্দা ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকার ঋণ নিল ব্যবসা বড় করার জন্য। রতন মিয়ার আশা ছিল সে ব্যবসা করে সব দায় পরিশোধ করে দিতে পারবে। কিন্তু তার ব্যবসা পরপর কয়েক বছর বিশাল লোকসান করল এবং হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যাশ টাকা না থাকায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে সে ব্যর্থ হলো। এই অবস্থায় ব্যাংক রতন মিয়াকে কিছু সময় বাড়িয়ে দিল। তারপরও সে ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। এতে তার ঋণের দায় সুদ-আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকল।

এই ঘটনার পরিণতি কী? কয়েকটা সম্ভাব্য চিত্র আছে। হতে পারে রতন মিয়ার অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু সে সব সম্পদ বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে চায় না। তখন ব্যাংক নিজে ব্যবস্থা নেবে। সাধারণত ঋণ নিতে হলে কোনো

কিছু জামানত (কোল্যাটেরাল) রাখতে হয়। সেটা জমি, বাড়ি, কারখানা বা মূল্যবান কোনো সম্পদ হতে হয়, যাতে ঋণগ্রহীতা টাকা ফেরত না দিলেও সেই জামানত বিক্রি করে ব্যাংক ঋণের টাকা ফেরত পেতে পারে। তাই ব্যাংক প্রথমত রতন মিয়ার জামানত বাজেয়াপ্ত করবে। ব্যাংক দেখবে তাদের পাওনা টাকা এই সম্পদ বিক্রি করে আদায় করা সম্ভব কি না। কারণ, এমন হতেই পারে যে রতন মিয়া ১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার জন্য ৫০ লাখ টাকার সম্পদ জামানত রেখেছিল। সে যখন টাকা দিতে না পেরে সময় ক্ষেপণ করছে, তত দিনে সুদে-আসলে পাওনা বেড়ে গিয়ে ২ কোটি টাকা হয়েছে। তাহলে জামানতের ৫০ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাংকের মোট দায় পূরণ হচ্ছে না। এবার ব্যাংক আইনের আশ্রয় নেবে, যাতে রতন মিয়ার বাকি সম্পদ বিক্রি করে হলেও তারা টাকা ফেরত পায়। এজন্য তারা আদালতে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই আদালত সকল ব্যাপার দেখে সেই পাওনা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

আদালত যখনই দেখবে যে রতন মিয়ার সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ মিলেও ২ কোটি টাকা পরিশোধ করা যাচ্ছে না, তখন যা আছে সবটুকু নিয়ে ব্যাংককে দেওয়ার পর রতন মিয়াকে 'দেউলিয়া' ঘোষণা করা হবে। দেউলিয়া ঘোষণা করার পর রতন মিয়ার আয়ের একটা অংশ নিজের জরুরি কাজে ব্যয় করার জন্য রেখে বাকি অংশ ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

এবার ধরি, রতন মিয়া নিজের নামে ঋণ নেয়নি। হাজারো চালাক-চতুর ঘাগু ব্যবসায়ীর মতো সে তার প্রতিষ্ঠান 'রতন'স দেশি শুজ'-এর নামে ঋণ নিয়েছে। সুতরাং, একটা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নালন্দা ব্যাংকের সকল ঋণের দায়ভার 'রতন'স দেশি শুজ' কোম্পানির। কিন্তু নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধে কোম্পানি ব্যর্থ হলো। ব্যাংক এবারও আগের মতো জামানত বাজেয়াপ্ত করে নেবে। তারপর কোম্পানির যত সম্পদ আছে, সেগুলো দিয়ে ঋণ শোধের জন্য আদালতের কাছে যাবে। এবার আদালত একটু অন্য রকম কাজ করবে। সেটা হলো, আদালত 'রতন'স দেশি শুজ' কোম্পানির পুরো আর্থিক অবস্থা ঘেঁটে দেখবে যে কে কে টাকা পায় কোথা থেকে 'রতন'স দেশি শুজ' টাকা পায় এবং 'রতন'স দেশি শুজ'-এর মোট সম্পদ কী কী আছে। এগুলো সব জেনে বিজ্ঞ আদালত 'রতন'স দেশি শুজ'-এর সকল পাওনাদারের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা নেবে। ধরি, শুধুই নালন্দা ব্যাংক টাকা পায়। তাহলে ব্যাংকের ২ কোটি টাকা শোধ দেওয়ার জন্য কোম্পানির সকল আয়, পাওনা ও সম্পদ একত্র করা হবে। এতে করে যদি এই ২ কোটি টাকা

পাওনা শোধ হয়, তাহলে সেটা শোধ করা হবে এবং বাড়তি কিছু থাকলে সেগুলো প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে ফেরত যাবে।

সব সময় যে কোম্পানিকে নিলামে বিক্রি করে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়, তা নয়। কোম্পানি সম্ভাবনাময় হলে দেউলিয়া ঘোষণার পরবর্তীতে কোম্পানি ব্যবসা করতে পারে কিন্তু আয়ের সবটা দিয়ে ঋণের দায় পূরণ করে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসার ওপর মালিকের মালিকানা শেষ হয়ে যায়। তবে মালিকের অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিরাপদ থাকে।

এই যে কোম্পানির সম্পদ জব্দ হলেও মালিকদের নিজস্ব সম্পদ নিরাপদ থাকল, এটাকে লিমিটেড কোম্পানি বলে। আবার এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোম্পানির লোকজন পয়সা নয়ছয় করে নামে-বেনামে সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দেয়; যাতে পাওনাদারদের কোনো পয়সা দেওয়া না লাগে। যদিও ব্যাপারটা সহজ নয়, তবু এ রকম নিন্দনীয় কাজ সমাজের অনেকে করে বসে।

কিন্তু 'রতন'স দেশি শুজ'-এর মালিক রতন মিয়া নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে লাভ কী? লক্ষ্য করুন, ঋণের দায় যদি রতন মিয়ার নিজের ওপরে হয়, তাহলে ১ কোটি টাকার ঋণ ২ কোটিতে যাওয়ার আগেই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করায় লাভ আছে। সেটা হলো, দ্রুত বিভিন্নভাবে ঋণ শোধ করে আর্থিক পঙ্গুত্ব থেকে বের হওয়ার রাস্তা সুগম করা। এমন হতেই পারে যে রতন মিয়া আসলে ১ কোটি ২০ লাখ শোধ করতে সক্ষম। সুতরাং, দেনা ২ কোটিতে উঠতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আগে আগে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে মোট দায় কমে এল।

অপরদিকে বিশেষ ক্ষেত্রে কোর্ট চাইলে লিমিটেড কোম্পানির সীমা অতিক্রম করে রতন মিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও জব্দ করে ব্যাংকের ঋণের দায় পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে পারে। তাই ঝুঁকি এড়াতে খুব শোচনীয় অবস্থায় যাওয়ার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভালো।

ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়াটা বোঝা গেল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব বিষয়টি কী? এই দেউলিয়াত্ব কীভাবে কাজ করে?

একটি রাষ্ট্র কীভাবে দেউলিয়া হয়?

যখন রাজা-বাদশাহদের হাতে রাজত্ব ছিল, তখন একটি রাজ্য কীভাবে দেউলিয়া হতো? একদম সরল হিসাব, বর্তমানের রতন মিয়ারা নিজের নামে ঋণ নিয়ে এখন যেভাবে দেউলিয়া হয়, ঠিক সেভাবেই রাজা-বাদশাহরা দেউলিয়া হয়ে যেত।

একটা সময় অনেক প্রতিষ্ঠানের হাতে বিভিন্ন অঞ্চল ছিল। সেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো হোক কিংবা কোনো আধা আধুনিক রাজা হোক; নিজের নামে ঋণ না নিয়ে দেশকে জামানত রেখে তারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঋণ নিত। সেই সব ক্ষেত্রে তারা দেউলিয়া হতো প্রাতিষ্ঠানিক দেউলিয়ার মতো করে। এতে করে অঞ্চল চলে যেত সেন্ট্রাল গভর্নর কিংবা কলোনি করা দেশের কাছে অথবা অঞ্চলটাকে কবজা করে ঋণসহ কয়েক শো গুণ টাকা উশুল করা হতো। এরপর সেই অঞ্চলকে স্বাধীন করা হতো কিংবা কোনো প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো।

এখন আর রাজা-বাদশাহদের দিন নেই। রাজ্যের মালিক, হুকুমতে আলামপনা, শাহানশাহ টাইপের কেউ নেই যে দাবি করবে পুরো দেশের মালিক সে। আধুনিক রাষ্ট্র অনেক অনেক বেশি জটিল কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বদলে যাওয়া দুনিয়াতে এখন দেশ নামক সীমারেখার ভেতরে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরায় সেই দেশের সরকার। আর দেশ চালানোর জন্য সরকারের টাকা লাগে। এই টাকা আসতে পারে দেশের জাতীয় সম্পদ, যেমন তেল, গ্যাস, কয়লা বিক্রির টাকা থেকে, জমির খাজনা, জনগণের ওপর ধার্যকৃত ট্যাক্স, ভ্যাট, শুল্ক থেকে কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান; যেমন রেলওয়ে বা ডাক বিভাগের সেবার বিপরীতে সেবামূল্য বা আয় থেকে।

সরকার প্রচুর ব্যয় করে। মূলত প্রশাসন চালানোতে আর রাষ্ট্রের মূল সুবিধাগুলো নাগরিকের কাছে পৌছাতে এই ব্যয় করা হয়। এজন্য নথি ঘেঁটে দেখলে খেয়াল করবেন, বড় খরচগুলো হয় অবকাঠামো নির্মাণ, বেতন-ভাতা

দেওয়া, চিকিৎসাসেবাদান, শিক্ষা খাত, খাদ্যনিরাপত্তা, ভর্তুকি দেওয়া এবং উন্নয়ন খাতে।

কোনো বছর আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে সরকার ঋণ নিয়ে কাজ করতে থাকে। এই ঋণ নিতে সরকার সাধারণত সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল ছাড়ে।[১] সরকার যখন সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল ছাড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক কিংবা জনগণ তা কেনে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে তারা সুদে-আসলে সব টাকা ফেরত পায়।

বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনি আসলে সাদাসিধা। আয় আছে, ব্যয় আছে এবং টানাটানি পড়লে ঋণ নেওয়ার ভালো ব্যবস্থা আছে। সরকার সময়মতো ঋণ শোধ না করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর জনগণ কি তেড়ে আসে? সরকার তো তাহলে সময় নিয়ে রয়েসয়ে টাকা ফেরত দিতে পারে। দেউলিয়া হতে হবে কেন, নিজেদেরই তো সরকার!

আসলে পরিস্থিতি অতটাও সাদাসিধা না। প্যাঁচের প্রথম পার্ট হলো, একটি দেশের টাকা সরকারের নিজের নয়। টাকাটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঋণ ব্যবসায়ী। সে তার পাওনা আদায় করেই ছাড়বে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর ঋণ ব্যবসায়ীর তালিকায় রয়েছে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। এরা অর্থনীতির সিংহভাগ টাকা তৈরি করে ও সরকারকে ঋণ দেয়। এদের হাতেও সরকার ধরা। এজন্য আমরা রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব বোঝানোর অংশ হিসেবে টাকার ব্যাপারটা আলোচনা করব।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পর রয়েছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। সরকার শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস বা দেশের ভেতরের টাকাই ঋণ নেয় না, বরং যত দেশের কাছে পারা যায়, সব দেশের থেকে ঋণ নেয়। সেই হিসেবে রুপি, পাউন্ড, ইয়োরো, ইয়েন–সব মুদ্রাতেই ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে সরকার ঋণ নেয়। এ ছাড়া আছে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকে ইত্যাদি। এদের কাছেও ঋণ পাওয়া যায়। ঘরের মানুষকে আপনি যা-ই বুঝ দেন, পাশের বাড়ির করিম মিয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মাছ ধরার জাল কিনলে সুদে-আসলে টাকা ফেরত দিতে হবে। নইলে জালও যাবে, মাছ ধরার সুযোগও হারাবেন। সুতরাং বৈদেশিক ঋণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছের ঋণ নিয়েও আলোচনা হবে।

---

১ সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল হচ্ছে একপ্রকার ঋণের দলিল, যার মাধ্যমে টাকা ধার নেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে এই টাকা সুদে-আসলে ঋণগ্রহীতাদের ফেরত দেওয়া হয়।

আরেকটা বড় ব্যাপার হলো বৈদেশিক বাণিজ্য। আপনি ভারতের পেঁয়াজ কিনবেন টাকায়, নাকি জাপানি গাড়ি কিনবেন টাকা দিয়ে? কোনোটাই পারবেন না। সুতরাং আপনার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাতে হবে 'ডলার' মুদ্রায়। একটা দেশ যা আয় করে কিংবা যা ব্যয় করে, সেখানে ডলারের বি-শা-ল ভূমিকা আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এই জায়াটাতে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর তাই একটা দেশের দেউলিয়াত্বে রিজার্ভের ভূমিকা এবং ডলারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় আনা হবে।

দেখা যাচ্ছে যে নিজ দেশের বাইরে থেকে ঋণ নিলে নিতে হবে ডলারে, বাণিজ্য করতে হবে ডলারে, রপ্তানি থেকে আয় করতে হবে ডলারে, ঋণ শোধ দিতে হবে ডলারে...ঋণ শোধ না করতে পারলে যে পরিণতি ভোগ করতে হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেই হিসাবটাও আসবে ডলারে...সুতরাং রাষ্ট্র দেউলিয়া হওয়ার অনেক বড় অনুষঙ্গ এই 'ডলার' নিয়েই আমরা গভীর অনুসন্ধান করব, যাতে আমরা বুঝতে পারি কে কার ভাগ্য নিয়ে কীভাবে ছিনিমিনি খেলছে...!

টাকা ছাপানোর সাথে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের রহস্য

আমরা এবার কিছুটা আঁচ করতে পারছি যে একটা দেশের দেউলিয়া হওয়ার সাথে ঋণ ও টাকার সম্পর্ক বেশ জোরালো। সরল করে যদি বলি, দেশ দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ঋণের এবং ঋণের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে টাকার। সুতরাং যার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নেই, সে দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং যার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে, সে কোনো দিন দেউলিয়া হয়ে যাবে না।

এই কথাটাই আরেকভাবে বলি, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে টাকা ছাপানোর ক্ষমতা থাকলে সে কোনো দিন দেউলিয়া হবে না; কারণ, সে টাকা ছাপিয়েই সব ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, টাকা ছাপানোর ক্ষমতা যার হাতে আছে, সে কোনো দিন ঋণই নেবে না; কারণ, টাকার অভাববোধ থেকেই আমরা ঋণ নিয়ে থাকি। সেই হিসাবে সরকারের ঋণ নেওয়ার কথাই নয়, যেহেতু তার হাতে টাকা ছাপানোর ক্ষমতা আছে। আর সরকার যদি ঋণ নিয়েও থাকে, তার দেউলিয়া হওয়ার কথা নয়; কারণ, টাঁকশালে টাকা ছাপিয়েই সে সব ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবে। তাহলে কেন একটা দেশ দেউলিয়া হচ্ছে?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ওপরের কথাটি সত্য নয়। অর্থাৎ সরকারের হাতে টাকা ছাপানোর 'ক্ষমতা' আছে, সেটা জনগণকে পইপই করে বলা হলেও বাস্তবে সামান্য কিছু ভাঙতি পয়সা ছাড়া সরকার নিজের ইচ্ছেমতো একেবারেই টাকা ছাপাতে পারে না। সরকার যদি টাকা ছাপানোর ক্ষমতা রাখত, তাহলে জনগণের কাছ থেকে কর নিতে হতো না, কাগজের মতো টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের সকল ব্যয়ভার বহন করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে কর, শুল্ক, মূসক ও টোল আদায় করে সরকার সব টাকা গুনে গুনে খরচ করে। যে বছরগুলোতে সরকারের আয় হয় কম, সেই বছরগুলোতে সে ঋণ নিয়ে

ব্যয়ভার বহন করে। আবার যে বছরগুলোতে সরকারের আয় হয় বেশি, সেই বছরগুলোতে সে বাড়তি টাকায় পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে। আসলে টাকা ছাপাতে পারে না দেখেই সরকারকে কর বা শুল্ক আদায় করতে হয়। টাকা ছাপাতে পারলে তাকে এই ঝামেলাগুলো পোহাতে হতো না।

আমরা যে 'কাগুজে নোটগুলো' ব্যবহার করি, সেগুলো ছাপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সব টাকার মালিক। আপনি, আমি বা সরকার কেবল ব্যবহার করার জন্য এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার পাই। এককথায়, আমাদের পকেটের টাকার মালিক আমরা কেউ নই, এগুলোর মালিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আপনি শুনে অবাক হচ্ছেন? অথবা ভাবছেন, 'নিজের আয় করা টাকা পকেটে আছে, কিন্তু এর মালিক আমি নই! এমনটা কীভাবে সম্ভব?' চলুন, একটি বাস্তবধর্মী উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরুন, আপনার প্রতিষ্ঠা করা একটি বোর্ডিং স্কুলে কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এই ছাত্ররা সারা দিনরাত আপনার জিম্মায় থাকে। কিন্তু আপনি তাদের বৈধ অভিভাবক নন। সন্তানদের প্রকৃত অভিভাবকেরা যখন ইচ্ছা তখন সন্তানদের স্কুল থেকে তুলে নিতে পারবে। তারা কিছুদিনের জন্য আপনার কাছে সন্তানদের পড়তে দিয়েছেন এবং পড়াশোনা শেষ হলে যার যার অভিভাবক তার তার সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। ঠিক একইভাবে, অর্থনীতিতে যত টাকা আছে, তা বিভিন্ন মানুষের হাতের মুঠোয় থাকলেও কেউ এগুলোর প্রকৃত মালিক নয়। একজন অভিভাবক যেমন করে তার সন্তানদের স্কুল থেকে তুলে নিতে পারে, ঠিক তেমনি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বিশেষ কায়দায় বাজার থেকে টাকা তুলে ফেলতে পারে। এই বিশেষ কায়দাগুলো বেশ চমকপ্রদ। পদ্ধতিগুলো বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাউকে দানদক্ষিণা করে না। আপনি-আমি তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দরজার সামনে অসহায় দরিদ্র মানুষের লাইন দেখতে পাই না। অসহায় মানুষ তো দূরে থাক, খোদ সরকারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিন্দুক থেকে টাকা তুলে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে না। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা মানুষের হাতে প্রবেশ করে কীভাবে? উত্তর হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণের নোট বা দলিলগুলোকেই আমরা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। দ্বিতীয়ত, বিপদে পড়া ব্যক্তিদেরও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ দেয় না। টাকা ছাপিয়ে সে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারকে বিভিন্ন উপায়ে ক্রমাগত ঋণ দেয় এবং একের পর এক ঋণের চক্র

ধারাবাহিকভাবে চালাতে থাকে; এভাবে সমাজে সব সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জোগান থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে টাকা ধার দেওয়ার একটি বহুল প্রচলিত উপায় হচ্ছে রেপো (Repo)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকার পরিমাণ কমানো প্রয়োজন, সে রেপোর পরিমাণ কমিয়ে টাকা তুলে ফেলা শুরু করে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সে বেশি বেশি রেপো ছেড়ে মোট টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফেলে। রেপো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সরাসরি ঋণ দিতে পারে। এভাবে সে বাজারে মোট টাকার পরিমাণ কম-বেশি করতে পারে।

টীকা : রেপো

রেপো কী জিনিস, এটা বোঝানোর অনেক দাঁতভাঙা, চুল পাকা অর্থনীতিবিদের মোটা চশমা টাইপ ব্যাখ্যা আছে, তবে সেগুলোকে পাশে রেখে একটা ঘটনার ঘনঘটায় ব্যাখ্যা দিতে চাই।

ধরি, দিদারুল আলম একজন পিঠা ব্যবসায়ী। তাঁর হাতে বানানো পিঠা খেতে সবাই পছন্দ করে। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে দিদার সাহেবের দোকানে ভিড় করে। ছোট ব্যবসায়ী দিদার সাহেবের ছোট্ট ছিমছাম সংসার আর এই পিঠালয়, এই নিয়ে তার দিন চলে। দিদার সাহেব পরিকল্পনা করলেন যে এবারের নবান্নের সময় পিঠা উৎপাদন দ্বিগুণ করবেন। কিন্তু পুঁজি কই? দিদার সাহেব গেলেন আমজাদ সাহেবের কাছে কিছু টাকা ঋণের জন্য। আসুন, তাঁদের কথোপকথন শুনি...

দিদারুল আলম : 'আমজাদ ভাই, আপনি তো আমার কাছের মানুষ, সামনের নবান্নতে পিঠা বেশি বানামু, ৮ হাজার টাকা দেবেন ভাই?'

আমজাদ সাহেব : 'দেখো, আমি ঋণ দেব ভালো কথা; কিন্তু আমার নিরাপত্তা কই? তুমি যদি ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারো? কিংবা টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে যাও?'

দিদারুল আলম : 'আমি সাধারণ মানুষ। এই জায়গায় এত বছর ধরে ব্যবসা করি। ঋণ নিয়ে আমি কোথায় পালাব?'

আমজাদ সাহেব : 'এভাবে বললে তো হবে না। আচ্ছা শোনো, এক কাজ করি। তোমার একটা সাইকেল আছে না? এর বাজারমূল্য তো প্রায় ৮ হাজার টাকা। তোমার থেকে আমি সাইকেলটি মাত্র ৭ হাজার টাকায় কিনে নেব। তবে সাথে সাথেই তুমি আমার থেকে সাইকেলটি আবার ৮ হাজার টাকায় কিনে নেবে এবং ১ বছর পরে দাম শোধ করবে।'

কিছু না বুঝে দিদারুল আলম জিজ্ঞেস করলেন, 'তাতে হলো কী?'

আমজাদ সাহেব : 'আমি তোমার সাথে সাইকেল কেনাবেচার মাধ্যমে ৭ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে এক বছরের মাথায় সুদে-আসলে ৮ হাজার টাকা ফেরত নিলাম।'
দিদারুল আলম চিন্তা করে বললেন, 'ভাই, টাকা দেওয়ার আছে কেন। বাজারমূল্যের থেকে কম দামে সাইকেল কিনে নাটক সাজানোর মানে কী?'
আমজাদ সাহেব বলল, 'দেখো, চুক্তি এভাবে করলে ঋণ নিরাপদ হয়। তুমি যদি টাকা ফেরত দিতে না পারো বা কোথাও পালিয়ে যাও, তখন আমি সাইকেলটা বিক্রি করে দিতে পারব।'
'এতে আমার লাভ?' উৎসুক ভঙ্গিতে দিদারুল আলম জিজ্ঞেস করলেন।
'এমনিতে আমি ২০ শতাংশে সুদে ঋণ দিই। কিন্তু আমি সাইকেল কিনে (purchase) পুনরায় বিক্রি করার (repurchase) চুক্তি করলে ঋণ খুব নিরাপদ হয়। তাই আমি সাত হাজার টাকা ঋণে এক হাজার টাকা সুদ রাখতে পারি।' বললেন আমজাদ সাহেব।
ঠিক এভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর থেকে কম দামে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট কিনে (purchase করে) পরবর্তীকালে বেশি দামে বিক্রির চুক্তি করে। এই repurchase agreement-কেই সংক্ষেপে ইংরেজিতে বলে repo বা রেপো।[২]
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেপো করার একটা উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ ঋণ দেওয়া ও সুদ নেওয়া। কিন্তু এটাই সব নয়, তাদের আরেকটা বড় উদ্দেশ্য আছে। সেটা হলো, এই ঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে টাকার জোগান দেওয়া বা তারল্য বজায় রাখা। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চিত করে যে জনগণের কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট কাগজের টাকা যেন বাজারে থাকে। তাই যখন রেপো করে কোনো ব্যাংক, তখন অর্থনীতিতে টাকা প্রবেশ করে আর যখন রেপো শোধ হয়ে যায়, তখন অর্থনীতি থেকে টাকা কমে যায়। রেপোর মেয়াদ শেষ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকাটা থাকা প্রয়োজন, সে চুক্তি নবায়ন করে।

দ্বিতীয় যে বহুল প্রচলিত উপায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করায় তা হচ্ছে সরকারকে ঋণ দেওয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেকেন্ডারি মার্কেট কিংবা প্রাইমারি মার্কেট[৩] থেকে সঞ্চয়পত্র কিনে সরকারকে ঋণ দিতে পারে। যে উপায়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়পত্র কিনুক না কেন, ঋণ দিলেই বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করে। বিষয়টি কীভাবে কাজ করে, তা এক বৃদ্ধ সজল দাদুর গল্পে ব্যাখ্যা করা যাক।

---

২ মজার ব্যাপার হলো, ইসলামি অর্থনীতিতে এটা একপ্রকারের 'বাইউল ইনা' বা 'বাহানামূলক বাণিজ্য' এবং এই ধরনের বাণিজ্য সুদ বা রিবার অন্তর্ভুক্ত এবং এই ধরনের লেনদেন করা সম্পূর্ণ নিষেধ! নিষিদ্ধ সুদ ও এ রকম বাহানামূলক বাণিজ্য সম্পর্কে জেনে সেগুলো পরিহার করতে পড়তে পারেন মোহাইমিন পাটোয়ারীর 'সুদ হারাম, কর্জে হাসানা সমাধান' বইটি।

৩ দেখুন টীকা– প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট

মনে করি, সজল দাদু কাজ করতেন রেলওয়েতে। সীমিত আয় দিয়ে প্রতি মাসে ৫টা ১০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনতেন। অবসরে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে বিগত ২০ বছরে কেনা ৫ × ১২ × ২০ = ১২০০ শত ১০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র বা বন্ড আছে। এখন, তাঁর কাছে বন্ড আছে কিন্তু টাকা নেই। এবার অবসরে গিয়ে জমিজিরাত কিনে বসবাস করার জন্য তিনি এগুলো বিক্রি করতে চান। তিনি কোনো ব্যাংকে গিয়ে বন্ড ভেঙে টাকা আনবেন। এ রকম পুরো দেশে ১০০ মানুষ হয়তো এক মাসে বন্ড ভেঙে টাকা তুলবেন। যখনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ড কিনবে তখনই অর্থনীতিতে নতুন করে টাকা প্রবেশ করবে।

তবে বন্ডের কেনাবেচা হলেই যে অর্থনীতিতে টাকা প্রবেশ করবে, ব্যাপারটি এমনও নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখনই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সজল দাদুর হাত থেকে বন্ডগুলো কিনে নিল, তখনই দাদুর অ্যাকাউন্টে নতুন টাকা প্রবেশ করলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাদে বাকিরা নিজেদের বন্ড লেনদেন করলে অ্যাকাউন্টের টাকাটাই কেবল হাতবদল করবে।[৪] এতে করে অর্থনীতিতে মোট কাগুজে টাকার পরিমাণে কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সঞ্চয়পত্র কেনে।

টীকা : প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট

দৈনন্দিন জীবনে কিছু জিনিস আছে, সেগুলো আমরা নতুন কিনি এবং চাইলে বিক্রি করে দিই। যখন কিনি, তখন নতুন থাকে আর যখন বেচি, তখন সেটাকে 'সেকেন্ড হ্যান্ড পণ্য' বলে। প্লাস্টিকের বাজারে নতুন প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্রের একটা সুন্দর নাম আছে, ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল! এখন, আপনি মুঠোফোন কেনেন কিংবা ইয়া বড় চায়ের ফ্লাস্ক, নতুন জিনিস হলে সেটা বিক্রির জায়গাকে বলে প্রাইমারি মার্কেট। প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে আপনারা প্রাইমারি মার্কেট কথাটা শুনে অভ্যস্ত নন। কিন্তু যখনই আপনার হ্যান্ডসেট বেচতে গিয়েছেন কিংবা ফ্লাস্কের বিনিময়ে পেঁয়াজ নিয়েছেন, তখনই এই দুইটা গিয়ে পড়েছে সেকেন্ড হ্যান্ড পণ্যের মার্কেটে, যেটা আসলে সেকেন্ডারি মার্কেট। একটি গল্পের দ্বারা বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝানো যাক।

আপনার পাশের গ্রামে বড় একটি ঝিল আছে। একটা ডেভেলপার কোম্পানি এসে বালি ফেলে গ্রামের মাঝের মস্ত বড় একটি ঝিল ভরাট করে

---

৪ যেহেতু এক একজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট একেক ব্যাংকে থাকবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি দ্বারা প্রায় প্রতিটি ব্যাংকেই নতুন টাকা প্রবেশ করবে এবং অর্থনীতিতে মোট টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

ফেলল। তারপর তারা ঝিলের ভরাট করা জমি 'আইজুদ্দীন স্বপ্নবিলাস হাউজিং' নাম দিয়ে প্লট আকারে ভাগ করে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিক্রি করে দিল। যারা জমি কিনল, তারা সব সময় এখানে থাকবে এবং একবার ডেভেলপার কোম্পানির থেকে জমি কেনার পর সব লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যাপারটি কি এমন? নাহ্, জমির মালিক চাইলে জমি হাতবদলও করতে পারেন। এভাবে সব সময় জমি বেচাকেনা চলতে থাকে। ডেভেলপার কোম্পানির ঝিল ভরাট করে হাউজিং বানিয়ে প্লট আকারে জমি বিক্রি করার ব্যাপারটাকে বলে প্রাইমারি মার্কেট। কারণ, এক্ষেত্রে জমি তারাই প্রথমবারের মতো প্রস্তুত করেছে এবং তাদের হাত দিয়ে ভোক্তারা সরাসরি পণ্য কিনেছে। পরবর্তীতে যখন জমির এক মালিক থেকে অন্য মালিকের কাছে বেচাকেনা চলে, তখন সেই বাজারকে বলে সেকেন্ডারি মার্কেট। কারণ, যে দুজন বেচাকেনা করছে, কেউই জমিটা বানায়নি বা তৈরি করেনি। তারা শুধু নিজেদের মাঝে লেনদেন করেছে। এখন কোনো ক্রেতা যদি ডুপ্লেক্স বাড়ি বানিয়ে বিক্রি করে, প্রথমবার বিক্রির সময় সেটা সেই ডুপ্লেক্স বাড়ির প্রাইমারি মার্কেট হবে। কেউ সেই বাড়ি কিনে আবার বিক্রি করতে চাইলে তখন সেটা হয়ে যাবে সেই ডুপ্লেক্সের সেকেন্ডারি মার্কেট।

শেয়ারবাজারও এমন। প্রথম যখন কোম্পানিগুলো শেয়ার ছেড়ে টাকা তোলে, তাকে বলে আইপিও। এটি একটি প্রাথমিক বাজার। আইপিওতে যারা শেয়ার কিনেছেন, তারা যে সব সময় শেয়ারগুলো নিজেদের হাতে ধরে রাখেন, ব্যাপারটি এমন নয়। পরবর্তীতে ক্রেতারা একজন আরেকজনের সাথে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেন করে।

সঞ্চয়পত্রের ব্যাপারটাও ঠিক এমন। সরকার যখন বন্ড বিক্রি করে এবং প্রথমবারের মতো ক্রেতারা সেই বন্ড কেনে, সেটা বন্ডের প্রাইমারি মার্কেট। এরপর সেই বন্ড গ্রাহকেরা বিভিন্ন সময় সেগুলো বিক্রি করতে থাকে এবং বিভিন্ন পক্ষ কিনতে থাকে। এভাবে শেয়ারবাজারের মতো সঞ্চয়পত্রের বাজারে সারাক্ষণ লেনদেন চলতে থাকে। পরবর্তী এই লেনদেনগুলো সব বন্ডের সেকেন্ডারি মার্কেট।

আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার ফাঁদ

আমরা আলোচনা করছিলাম রাষ্ট্রীয় (সরকারি) দেউলিয়াত্ব নিয়ে। সেখান থেকে মুদ্রাব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করলাম কেন? সত্যি কথা বলতে, বর্তমান বিশ্বে দেউলিয়াত্ব বোঝার জন্য আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার ফাঁদ বোঝাটা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ঋণ এবং মুদ্রা একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লক্ষ্য করে দেখুন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণের মাধ্যমে বাজারে নোট প্রবেশ করায় (সঞ্চয়পত্র কেনে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয়) এবং ঋণ পরিশোধ করা হলে বাজার থেকে টাকা আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিন্দুকে ফেরত যায়। তাই একটি অর্থনীতিতে সবাই যদি নিজ নিজ ঋণ পরিশোধ করে দেয়, সেই দেশে কোনো টাকাই থাকবে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, টাকা = ঋণ এবং ঋণ নেই মানে কোনো টাকাও নেই।

এবার আপনাদের একটি প্রশ্ন করি। সব টাকাই যদি ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে? একজন সাধারণ ব্যক্তিকে আপনি ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১১০ টাকা ফেরত চাইলে সে হয়তো তা ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু যদি অর্থনীতির প্রতিটি টাকাই ঋণ হয়, এই ঋণের দায় সুদে-আসলে পূরণ হওয়া কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, অসম্ভব। সহজভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে একটি গল্প শুরু করা যাক।

জুহরি একজন ধূর্ত রাজা। সে তার প্রজাদের আজীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রার একটি ছাঁচ তৈরি করল। তারপর সে সমগ্র রাজ্যজুড়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করল, 'জুহরির ছাঁচযুক্ত সোনার মুদ্রাই একমাত্র বিনিময়মাধ্যম।'

এই খবর শুনে সবাই খুব চিন্তিত হয়ে গেল। লোকজন বলাবলি করতে লাগল, 'আমাদের হাতে যে সোনার মোহর আছে, তা দিয়ে যদি লেনদেন করতে না পারি, আমরা কীভাবে বেচাকেনা করব?' এমন সময় একজন বলে উঠল, 'চল, সবাই রাজদরবারে গিয়ে বলি, আমাদের যার যার সোনার মোহরে

ওনার সিল মেরে দিতে। তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' এই পরামর্শ মোতাবেক সবাই জুহুরির দরবারে ভিড় করল। তারা বলল, 'আমাদের মুদ্রাগুলো আপনার কাছে জমা দিচ্ছি। আপনি এগুলোতে সিল মেরে দিন।'

এই কথা শুনে জুহুরি কঠিন হাসি হেসে বলল, 'তা কি হয়? আমি কাউকে সিল দেব না। আমার সিন্দুকের ভেতরে যে কটি মুদ্রা আছে, তা-ই একমাত্র বিনিময়মাধ্যম।'

এই কথা শুনে সবাই প্রশ্ন করল, 'আপনার সিন্দুকের সিলমারা মুদ্রাগুলো আমাদের হাতে আসবে কীভাবে?'

উত্তরে শক্ত হাসি হেসে জুহুরি বলল, 'ঋণ হিসেবে।'

জুহুরির কথা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়েই তারা ঋণ নিতে আবেদন করল। ঋণপ্রার্থীদের মধ্য থেকে সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের জুহুরি বাছাই করে বলল, 'এই নাও ঋণ। আমাকে এই মুদ্রাগুলোই সুদে-আসলে বাড়তি ফেরত দিয়ো। অন্যথায় তোমাদের সম্পদ জব্দ করা হবে।'

এবার সবাই একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তাদের মাঝে সাহসী একজন বলেই ফেলল, 'হুজুর, আপনি আমাদের যে মুদ্রা ধার দিলেন, সেই মুদ্রাগুলো বাড়তি ফেরত চাইতে পারলেন কীভাবে! মুদ্রা তো ডিম পাড়ে না যে বাচ্চা ফুটে সংখ্যায় বেড়ে যাবে। এদিকে আমাদের হাতেও কোনো সিল নেই যে আমরা নতুন মুদ্রা তৈরি করব।'

মনে মনে জুহুরি ভাবল, 'এটাই তো আমার কৌশলে সম্পদ জব্দ করার ফাঁদ।' তবে মনের কথা গোপন রেখে রাগী কণ্ঠে সে বলল, 'সবকিছু ঠিক থাকলে ভবিষ্যতে আমি আরও বেশি ঋণ দেব। সেই মুদ্রা দিয়েই এই মুদ্রার ঋণের দায় পূরণ করতে হবে।'

এবারও সবাই একে অপরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। একসময় একজন প্রশ্ন করে বসল, 'নতুন যে মুদ্রাগুলো ঋণ হিসেবে দেবেন, সেগুলো কি সুদমুক্ত?'

'মাথা খারাপ?' জুহুরি চিৎকার করে উঠল, 'সুদ ছাড়া কোনো ঋণ আমি দিই না। তোমরা যে যত পয়সা নেবে, আমাকে সবগুলো বাড়তি ফেরত দিতে হবে।'

এবার এক প্রতিবাদী যুবক বলে উঠল, 'আপনি যে প্রতিটি পয়সা সুদের ওপর ঋণ দিচ্ছেন, আমরা কীভাবে এর দায় শোধ করব? দিন দিন আমরা সবাই তো ঋণের চাপে দেউলিয়া হয়ে যাব।'

রাগে লাল হয়ে জুহুরি গর্জন করে উঠল, 'আমি কি জোর করে কাউকে ঋণ দিচ্ছি? তোমরা এসেই তো আমার কাছে ঋণ খুঁজেছ। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে তোমরা সবাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী এবং দেউলিয়া হলে এমনটাই তোমাদের প্রাপ্য।'

পাশে থাকা বন্ধু সাহেব জুহুরির কানে কানে বলল, 'হুজুর, আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। জনগণের সব সম্পদ একদিন আপনারই হবে। বিষয়টি তো আপনি ভালো করেই জানেন। এরা যে যা বলার বলুক। সব কথা কানে না নিয়ে কৌশলে নিজের কাজ সারতে থাকুন। তবে সবচেয়ে ভালো হয় আমাকে একটি চাকরি দিলে। আমি সুন্দর পোশাক পরে, মিষ্টি মুখে এদের বোঝাব। আল্লাহ তো আপনাকে কম দেয়নি। আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আপনি একটু আনন্দ উপভোগ করুন।'

শুনতে হীরক রাজার গল্প বলে মনে হলেও আমরা ঠিক এমনই একটি সিস্টেমে বসবাস করছি। ওপরের গল্পের মতো আমাদের বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থায়ও ব্যাংকগুলো ঋণ হিসেবে টাকা দিয়ে আরও বেশি টাকা ফেরত চায়। ফলস্বরূপ আমরা এবং সরকার ক্রমান্বয়ে দেউলিয়া হতে থাকব। আলোচনার যতই সামনের দিকে যেতে থাকব, বিষয়টি আমাদের নিকট ততই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাংকিং সিস্টেম কীভাবে কাজ করে

আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর মালিক জনগণ। সেই হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের সম্পদ দখল করলে তা জনগণেরই থাকবে। আপনি যদি এমনটাই ভেবে থাকেন, হয়তো জেনে অবাক হবেন যে ধারণাটা মোটেও সত্যি নয়। সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পূর্ণ আলাদা দুটি প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দেখভাল, নিয়ন্ত্রণ এবং কল্যাণ সাধন করাটাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজ। ইতিহাস ঘাঁটলে আপনারা দেখতে পাবেন, প্রাইভেট ব্যাংকারদের জোট হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যাত্রা শুরু করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সম্পূর্ণ বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯১৩ সালে তৎকালীন আমেরিকার সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হাতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতারাও ছিল প্রাইভেট ব্যাংকার।[৫] তার মানে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো জনগণের প্রতিনিধি নয়। এরা প্রাইভেট ব্যাংকারদের প্রতিনিধি। তাদের দেখভাল এবং কল্যাণ সাধন করাটাই এদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মনকে সান্ত্বনা দিতে আপনি বলতে পারেন, 'অল্প কিছু ব্যক্তির হাতে টাকার উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকাটা কি খুব সমস্যাজনক? কিছু ব্যক্তির হাতে মুদ্রাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকতেই পারে। তাতে সমস্যা কী? আমরা তো আমাদের মতন সুন্দর বেঁচে আছি।'

একবার চিন্তা করে দেখুন, টাকা হচ্ছে এমন একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু, যার চাহিদা অসীম। আপনার হাতে যদি অসীম চাহিদার একটি বস্তু থাকত, আপনি কী করতেন? প্রথমত, আপনি মোটা অঙ্কের মুনাফা করতেন। দ্বিতীয়ত, সমগ্র জাতিকে নিয়ে আপনি খেলতে পারতেন। তৃতীয়ত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আপনি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন!

---

৫ এই বই লেখাকালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কল্পনা করুন যে পৃথিবীর কোথাও বিশুদ্ধ পানির উৎস নেই। একমাত্র আপনিই বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে পারেন। সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজা ও প্রজাকে বিশুদ্ধ পানির জন্য আপনার দ্বারস্থ হতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে একচেটিয়া ক্ষমতা খাটিয়ে আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মুনাফা করতে পারবেন। কেউ আপনার অবাধ্য হলে তাকে বিশুদ্ধ পানির উৎস থেকে বঞ্চিত করে আপনার বাধ্য করতে পারবেন। এককথায় মানুষের জীবন ও সমাজকে আপনি পুতুলের মতন নাচাতে পারবেন।

টাকা ঠিক এমনই একটি বস্তু। এজন্যই একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব ব্যাংকারদের হাতে তুলে দেওয়া মাফিয়াদের হাতে আর্মি তুলে দেওয়ার সমান। কারণ, আমরা কেউ টাকা তৈরিও করতে পারি না এবং টাকা ছাড়া আমরা কেউ চলতেও পারি না। তাই সমাজের খুব অল্প কিছু লোভী ও স্বার্থপর ব্যক্তি যদি টাকা তৈরি করতে পারে, তারা পুরো সমাজকে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।
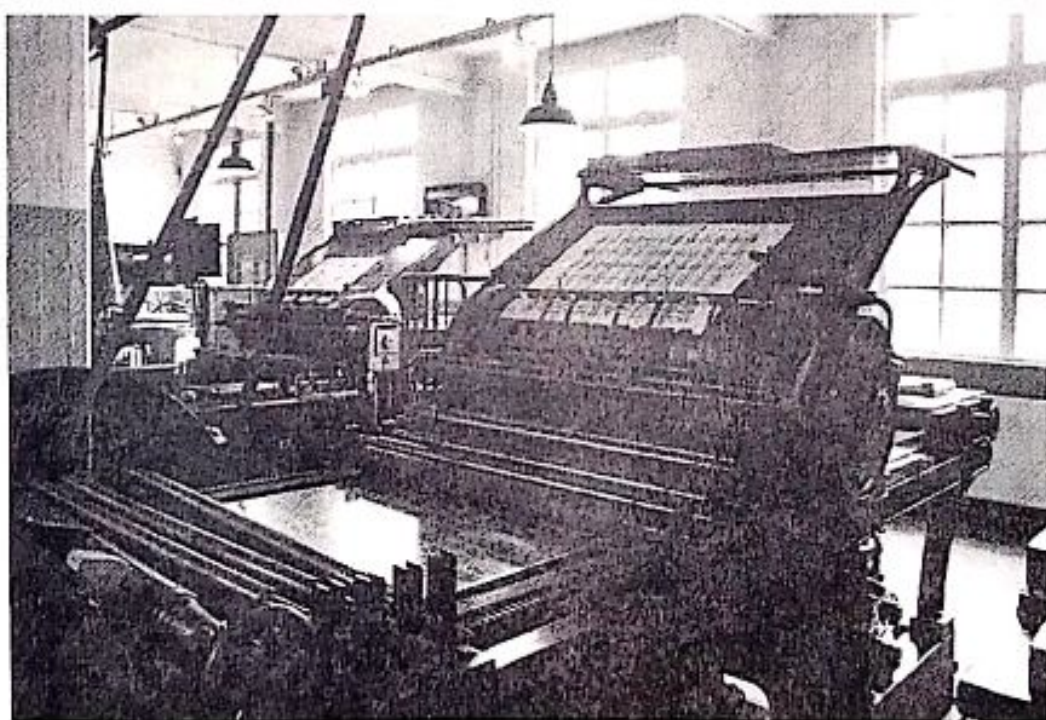
চিত্র : টাকা ছাপানোর প্রেস মেশিন

এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন করি,

১। মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে কে বা কারা?

২। যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সরকারি, সেই দেশের মুদ্রাব্যবস্থা কি স্বাধীন?

বড় বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর অনেকেই যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, তা জেনে আপনারা যতটা অবাক হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি অবাক হবেন এই কথা জানলে যে বাজারে চলমান মোট মুদ্রার খুব সীমিত পরিমাণই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো উৎপাদন করে। অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ে মুদ্রা উৎপাদনে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। এখানে মুদ্রা উৎপাদন বলতে 'টাকা ছাপানো' বোঝানো হচ্ছে না, জনাব, টাকা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই ছাপায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ছাপানো টাকার বাইরেও টাকা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে টাকা প্রিন্ট করে, তাকে বলে সরু টাকা (Narrow Money) এবং এটাকে M0 সংকেতে প্রকাশ করা হয়। এই M0 যদি ১০০ টাকা হয়, তাহলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ছাপানো এই ১০০ টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা ঋণ দিতে পারবে! এই বাড়তি ১৯০০ টাকাকে বলা হবে মোটা টাকা বা Broad Money এবং এর সংকেত হলো M1 ও M2, অর্থাৎ কোনো দেশের M1 + M2 = Broad Money, যা অর্থনীতিতে M0 ছাড়াও প্রচলিত আছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এই বাড়তি টাকাগুলো ব্যাংকিং জাদু দিয়ে তৈরি করেছে। 'জাদু'ই আসল শব্দ ভাই, এর থেকে আর ভালো শব্দ নেই। এই বই লেখার সময় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১০০ ছাপানো টাকার বিপরীতে বাণিজ্যিক (ইসলামি + বে-ইসলামি সবাইসহ) ব্যাংকগুলো ৭৭৪ টাকা বানিয়ে অর্থনীতিতে ছড়িয়ে রেখেছে।

আর ঠিক এই কারণেই শুধু টাকা ছাপানোর কারিগর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করে খুব বেশি লাভ নেই।[৬]

আপাতজটিল এই বিষয়গুলো বোঝার খুব শক্তিশালী একটি পদ্ধতি হচ্ছে বাস্তবমুখী উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা। ধরি, নওগাঁর ১০ জন ধনী কৃষক জনতা ব্যাংকে মোট ২০ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট) ডিপজিট করল। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরমান অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ রেশিও ৫%। রিজার্ভ রেশিও ৫% মানে হচ্ছে, জনতা ব্যাংকের হাতে মোট যত টাকা আছে, তার ২০ গুণ টাকা সে ঋণ দিতে পারবে বা মোট ইস্যুকৃত ঋণের বিপরীতে ৫% টাকা ব্যাংকের সিন্দুকে জমা রাখতে হবে। ধরা যাক, জনতা ব্যাংকের হাতে ২০ কোটি টাকা

---

৬ এর উজ্জ্বল দুটি উদাহারণ হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। এই দুই দেশের ব্যাংককে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন লেখকের 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি।

আছে। সে ১ কোটি টাকা সিন্দুকে রেখে বাকি ১৯ কোটি টাকা অবচেতন প্রকাশনীকে ঋণ দিল। এর ফলাফল কী হবে?

প্রথমত, অবচেতন প্রকাশনী এই টাকা দিয়ে একটি প্রেস মেশিন কিনবে। প্রেস মেশিনটি কেনার জন্য প্রেস মেশিনের আমদানিকারক মেসার্স ফকির এর রূপালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে অবচেতন প্রকাশনী টাকাটা ট্রান্সফার করে দিল। এভাবে ঋণের টাকাটা জনতা ব্যাংক থেকে রূপালী ব্যাংকে চলে গেল। লেনদেনটা এভাবে না হয়ে যদি ব্রিফকেসে হতো, তাতেও ফলাফল বদলাত না। সব টাকা ব্যাংকিং খাতেই ফেরত আসত। কারণ, ঘরে টাকা রাখা অনিরাপদ দেখে যার যত টাকা ঋণ হিসেবে ব্যাংক থেকে বের হবে, ঘুরেফিরে সবটাই আবার ব্যাংকিং খাতে ফেরত আসবে। এই অতি স্বাভাবিক বিষয়টির মাঝে টাকা তৈরির বিশাল রহস্য লুকানো আছে।

এখন জনতা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে রূপালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ১৯ কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। খেয়াল করে দেখুন, জনতা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা রূপালী ব্যাংকে যখন এসেছে, তখন তা ডিপজিট হিসেবেই প্রবেশ করেছে। তাই রূপালী ব্যাংক এই টাকার কিছু অংশ সিন্দুকে রেখে বাকিটা ঋণ হিসেবে বাজারে ছাড়তে পারবে। এবার রূপালী ব্যাংক চিত্রনায়িকা পরী বানুকে মোট ১৮ কোটি টাকা ঋণ দিল ডুপ্লেক্স বাড়ি নির্মাণের জন্য। আপনি যদি পরী বানুকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার হাতে মোট কত টাকা আছে?' উত্তরে তিনি বলবেন, '১৮ কোটি টাকা আছে।' কিন্তু একই সময়ে আপনি যদি প্রেস মেশিন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার হাতে মোট কত টাকা আছে?' তিনি বলবেন, 'রূপালী ব্যাংকে আমার মোট ১৯ কোটি টাকা আছে।' এদিকে নওগাঁর সেই ধনী ১০ জন কৃষককে জিজ্ঞেস করলে তারাও বলবে, 'জনতা ব্যাংকে আমাদের মোট ২০ কোটি টাকা আছে।' অর্থাৎ সবার টাকার যোগফল ৫৭ কোটি (২০ + ১৯ + ১৮) হয়ে গেল, যেখানে কাগজের নোটই ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকার।

আপনারা ভাবতে পারেন, মোট টাকা ৫৭ কোটি হয়নি। কারণ, গ্রাহকেরা নিজ নিজ টাকা ফেরত চাইতে এলে ব্যাংক তখন দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং সত্যটা উন্মোচিত হয়ে পড়বে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। ব্যাংক যাদের ঋণ দিয়েছে, তারা যদি দেউলিয়া না হয়; অর্থাৎ সকল ঋণগ্রহীতা সুদে-আসলে বাড়তি টাকা ফেরত দিতে পারে, তাহলে ব্যাংকও সবাইকে তাদের টাকা ফেরত দিতে পারবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ক্যাশ টাকা তোলার প্রয়োজন সব সময় সবার হয় না। ব্যাংক ডিপজিট দিয়ে আমরা চেকে বা কার্ডে কেনাকাটা করতে পারি। এজন্যই অর্থনীতিবিদগণ ব্যাংক

ডিপজিটকে টাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেও ব্যাংকের তৈরিকৃত টাকাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তাই কখনো যদি এমন হয় যে একটি ব্যাংক থেকে অনেকে ডিপজিট ভেঙে ক্যাশ তুলতে চাইছে, কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা না থাকায় ব্যাংক বিপদে পড়েছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই টাকা ছাপিয়ে তাদের সাহায্য করে।

লক্ষ্য করুন, বাস্তবে জনতা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে রূপালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যেমন টাকা ট্রান্সফার হয়, ঠিক তেমনি রূপালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেও টাকা ট্রান্সফার হয়। আবার রূপালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে মধুমতি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেও টাকা ট্রান্সফার হয়। যেহেতু সমাজের একেকজনের অ্যাকাউন্ট একেক ব্যাংকে আছে, সব মিলিয়ে ব্যাংকগুলোর দ্বারা তৈরিকৃত টাকা ঘুরেফিরে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ একটি অর্থনীতি সীমিতসংখ্যক কাগুজে নোট দিয়ে শুরু হলেও ব্যাংকের জাদুতে তা বহুগুণ বেড়ে যায়। এভাবে ব্যাংক কর্তৃক তৈরিকৃত টাকা চক্রাকারে বেড়ে যাওয়ার ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট।

মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট আরও ভালোভাবে প্রকাশ পায় ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে। এটাকে বলা যায় জাদুর ওপর মহাজাদু। আগে আমরা যখন বলেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা ফরমান অনুযায়ী রিজার্ভ র‍্যাশিও ৫%, তার মানে আসলে এই নয় যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২০ ভাগের ১ ভাগ টাকা সিন্দুকে রেখে ১৯ ভাগ টাকা ঋণ দিতে হবে। যদি ব্যাংকের কাছে থাকা ১০০ টাকার ৫ ভাগ রেখে বাকি ৯৫ টাকা ঋণ দেওয়া হয়, এটাকে বলে ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং। এজন্য আমরা বোঝানোর সুবিধার জন্য দেখিয়েছি যে ব্যাংকগুলো ডিপজিটের ৫% টাকা সিন্দুকে রেখে বাকি ৯৫% টাকা ঋণ দিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বর্তমানের এই রিজার্ভ র‍্যাশিও ৫% মানে হচ্ছে মোট ঋণের বিপরীতে ৫% টাকা ডিপজিট হিসেবে থাকতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকগুলো ১০০ টাকার পুরোটাই নিজ হাতে রেখে তার ২০ গুণ বা ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে দিতে পারবে! এটাই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এভাবে নতুন টাকা (ক্রেডিট মানি) তৈরি করে ঋণ দিতে পারে। বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, এমনটাই বর্তমান অর্থনীতির তিক্ত সত্য।

আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ব্যাংকের পাতাল ঘরে কি টাকা ছাপানোর মেশিন আছে, যে তারা নতুন টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেবে? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক, তবে ব্যাংকগুলো কাগজের টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয় না। তারা ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টে ঋণের অ্যামাউন্ট ডিপজিট হিসেবে দেখিয়ে দেয়।

যেহেতু বড় বড় সব লেনদেন চেকে বা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারে হয় এবং ক্যাশ টাকা ব্যাংকের বাইরে গেলে আবার তা ফেরত আসে, মোট ঋণের অল্প কিছু অংশ সিন্দুকে রাখলেই চলে, এত এত টাকা কেউ ক্যাশ করতে আসে না। সবাই কার্ডে বা ডিজিটে লেনদেন করে। তাই ব্যাংকের টাকা সিন্দুক থেকে সরে না। বিশেষ করে বড় বড় লেনদেন সব ব্যাংক ট্রান্সফার বা চেকের মাধ্যমে হয়। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ঋণগ্রহীতারা যদি টাকা তুলতে যায় এবং ব্যাংক সমস্যায় পড়ে, তখন কল মানি মার্কেট থেকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংক ক্যাশের অভাব পূরণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কোনো দেশে কী পরিমাণ ক্যাশ টাকা চলে, সেই অনুযায়ী ব্যাংক হাওয়াই টাকা তৈরি করে। যে দেশগুলোতে ক্যাশের চাহিদা বেশি (যেমন বাংলাদেশ), সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাথমিক টাকার তুলনায় সাত গুণ টাকা তৈরি করে ব্যাংক ব্যবস্থা। সেই তুলনায় যে দেশগুলোতে ক্যাশ টাকার চাহিদা কম (যেমন ইংল্যান্ড), সেখানে এই চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। যুক্তরাজ্যের মোট টাকার ৯৭%-ই বেসরকারি ব্যাংক তৈরি করে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মাত্র তিন শতাংশ মুদ্রা সরবরাহ করে। পৃথিবীর বাকি 'উন্নত' দেশগুলোর অবস্থা মোটেও ভিন্ন নয়।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এমন একটি প্রহসনমূলক ব্যবস্থা টিকে থাকে কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আপনাদের বুঝতে হবে যে ব্যাংকনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা আজ-কালকের ঘটনা নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রহসনমূলক ব্যবস্থায় দুনিয়া চলছে। সেজন্য আমরা আজ ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিজের শত্রু মনে না করে বন্ধু ভাবা শুরু করেছি। মনে করেন, আপনি সমস্ত বিশুদ্ধ পানির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। প্রথম বিশ-ত্রিশ বছর আপনি আন্দোলন, সমালোচনা ও গঞ্জনার শিকার হতে পারেন। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলে এবং সবাইকে পানি সরবরাহ করতে পারলে আপনার ব্যবস্থাকে সবাই জীবনের একটি অংশ হিসেবে ধরে নেবে। আপনাকে সবাই মনে করবে বিশুদ্ধ পানির প্রতীক। কেউ আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইলে তাকে প্রশ্ন করা হবে, 'বিকল্প ব্যবস্থা কী?'। আর যদি আপনার গড়া ব্যবস্থা ৩০০ বছর পার করতে পারে, সবাই একে রক্ষা করতে সিপাহির ভূমিকা পালন করবে। কারণ, তাদের কাছে মনে হবে বিশুদ্ধ পানির স্বাধীন কোনো উৎস নেই। ব্যাপারটা অনেকটা কয়েদখানায় জন্মানো ব্যক্তির মতো। তার কাছে জীবন মানেই কারাগার, তাই বাঁচতে হলে কারাগারকে রক্ষা করতে হবে, এমনটাই চিন্তা। জি, বর্তমান মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনই একটি বস্তু।[৭]

---

৭ বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি

তাসের ঘর

এই পর্যন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি

১. প্রতিটি টাকাই ঋণ।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ছাপানো কাগুজে টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাত দিয়ে বহুগুণে বেড়ে যায়।
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের বানানো টাকাও ঋণের আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে।
৪. ঋণগ্রহীতারা টাকা তৈরি করতে পারে না।

সুতরাং, সকল টাকা ঋণের বিপরীতে সুদের ওপর চলে, তাই মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে মোট ঋণের পরিমাণ কেবল বাড়াতেই হবে। ঋণ বৃদ্ধি ছাড়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

এবার বুঝলেন কেন উন্নয়নের নামে দেশি-বিদেশি ঋণের ভয়ানক তাণ্ডব চলছে? এটাই যে অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার মন্ত্র। আহ্! (দীর্ঘশ্বাস আর কফির কাপে হতাশাজনক চুমুক দিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ গাছের ডালে রোদ আর পাখির খেলা দেখে আসা...)

আচ্ছা, যা বলছিলাম, দিনে দিনে দেনা বাড়ানো বা ঋণের পরিমাণ এত এত বৃদ্ধি করার উপায় কী? ঋণ বৃদ্ধি করার একটি উপায় হচ্ছে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঋণের প্রবেশ করানো। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে ঋণ বৃদ্ধি করলে, যেমন পড়াশোনা করতে ঋণ নিলে, বাড়ি নির্মাণ করতে ঋণ নিলে, গাড়ি কিনতে ঋণ নিলে, বাজার করতে ঋণ নিলে, বিয়ে করতে ঋণ নিলে এই অর্থনীতি দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

ঋণ বৃদ্ধি করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে অর্থনীতির আকৃতি বড় করা। অর্থনীতির আকৃতি যত বড় করা যাবে, মোট ঋণের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে।

মনে করেন, একটি দেশের জিডিপি মোট ১০০ কোটি টাকা। কথার কথা, সেই দেশের ঋণ যদি জিডিপির ২৫০% হয়, দেশটি ২৫০ কোটি টাকার ঋণ নিতে পারবে। তাই দেশটির জিডিপি কোনো বছরে দশ শতাংশ বাড়লে ২৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ ইস্যু করা যাবে। এভাবে প্রতিবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলে ঋণের প্রবৃদ্ধিও বজায় থাকবে।

কিন্তু এত ঋণ কে নেবে, কোনো ব্যক্তি নাকি অন্য কেউ? আসলে সরকার নিজে ঋণ নিলেও চলবে। কোনো একটি দেশের ব্যাংকগুলো নিজ দেশের নাগরিকদের ঋণে জর্জরিত করার পর আর সুযোগ বাকি না থাকলে সরকার নিজে ঋণ নিয়ে জনগণকে উদ্ধার করতে পারে। সরকার যত বেশি ঋণ নেবে, অর্থনীতি তত দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে।

তবে সমস্যা হচ্ছে, এই পুরো ব্যাপারটাই একটা তাসের ঘরের মতো ঠুনকো...একটা তাস যদি সরে যায়, তবে ফুড়ুৎ, সব গেল। এজন্য এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচণ্ড শক্তি খরচ করা হয়। কাউকে টাকার আসল মর্ম, চক্রবৃদ্ধি সুদের ভয়াবহতা, জনগণের কাছ থেকে দিনে দিনে সম্পদ ব্যাংকের কাছে সরিয়ে নেওয়া–এগুলোর কোনোটাই কোনো শিক্ষাব্যবস্থায়, কোনো কোর্সে, কোনো কারিকুলামে ও কোনো গবেষণায় রাখা হয় না। তাদেরই প্রমোট করা হয়, যারা মূল সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়ক।

'Blessed are the young, for they shall inher it the national debt.'

– Herbert Hoover

31stPresidentof the United States from 1929 to 1933

'তরুণদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কারণ, তারা সব ঋণের উত্তরাধিকারী হবে।'

–হার্বার্ট হুভার

আমেরিকার ৩১তম রাষ্ট্রপতি (১৯২৯ থেকে ১৯৩৩)

টীকা : উল্টো চিন্তা

আজকাল মানুষজন খুব ট্যালেন্ট, এই ট্যালেন্ট দিয়ে যদি ভাবেন যে, আরেহ্, টাকা আর ঋণ বাড়ানো দরকার? টাকার মান কমিয়েও সেটা করা সম্ভব! কীভাবে? ধরি, একটা দেশের মানুষ প্রতি মাসে গড়ে ১ লাখ রুবল আয় করে। রুবলের মান কমিয়ে যদি অর্ধেক করে ফেলা হয়, তাহলে সেই দেশের মানুষ মাসে ২ লাখ রুবল আয় করবে। সেই হিসাবে আগে যদি তারা ১০ লাখ রুবলের দেনায় থাকত, বর্তমানে তারা ২০ লাখ রুবলের দেনা নিতে সক্ষম হবে।

আপনার অতি ভিলেন-টাইপ চিন্তাটা এক দিক দিয়ে সঠিক। মুদ্রার মান কমানোর জন্য অধিক পরিমাণ মুদ্রা বাজারে ছাড়তে হয়। আর নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়ার উপায় হচ্ছে ঋণ বাড়ানো। তাই, এদিক দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি এবং ঋণবৃদ্ধি এমনিতেই হাতে হাত ধরে চলে।

সরকারি ঋণের কলকবজা

ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়লে সরকার সঞ্চয়পত্র ছাড়ে। সঞ্চয়পত্রগুলো যখন আমরা কিনি, তখন আমরা বলতে পারি সরকার আমাদের থেকে ঋণ নিয়েছে।[৮] বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকেও সরকার ঋণ নিতে পারে। সবশেষে ঋণ নিতে সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থা বা রাষ্ট্রগুলোর কাছেও ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে। এককথায়, সরকার আপনার-আমার মতোই একটি অর্থনৈতিক সত্তা। ঋণ নিতে আমরা যেমন বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোন দিই, বিদেশে থাকা আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করি, কিংবা ব্যাংকে আবেদন করি, সরকারও তেমন করে। আবার ঋণ নেওয়ার পর সবাই যেমন দেউলিয়া হতে পারে, সরকারের ব্যাপারটাও তেমন। তবে বর্তমান বিশ্বে ঋণ লেনদেনের বিশেষ কায়দা আছে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে ঋণ মানে টাকা এবং সমাজে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়াতে বাধ্য (অন্যথায় মন্দা শুরু হবে)। বড় কোম্পানি বলুন, কি ছোট কোম্পানি; ব্যক্তি বলুন, কি সরকার–প্রায় সবাইকেই ঋণের চাপে জর্জরিত হতে হবে।

যেহেতু সব ঋণের দায় পরিশোধ করার সমান টাকা অর্থনীতিতে নেই, বাস্তবে কেউ ঋণ পরিশোধ করে না। সবাই যার যার কাঁধে ঋণের বোঝা নিয়ে বেড়ায় এবং নিয়মিত সুদ প্রদান করে যায়। বড় বড় সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও প্রায় সব দেশের সরকার এভাবেই চলছে। তারা প্রতিবছর কেবল সুদ দেয়। কেউ ঋণের আসল পরিশোধ করে না।

খেয়াল করে দেখুন, অনির্দিষ্টকালের জন্য কেউ কাউকে ঋণ দেয় না। প্রত্যেকটি ঋণেরই নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ আছে। মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা সুদে-আসলে পূরণ করতে হয়। কিন্তু কেউ যেহেতু আসল পূরণ করে না, তারা যা করে তা হচ্ছে ঋণ নবায়ন। নতুন ঋণ নিয়ে তারা কেবল

---

৮ এটা একপ্রকার পুনরায় ঋণ, যেহেতু টাকা প্রথমবার ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছিল এবং তারপর এই একই টাকা ঋণ আকারে সরকারের কাছে যাচ্ছে।

পুরাতন ঋণের আসল শোধ করে এবং সুদ প্রদানের ধারা চালিয়ে যায়। এভাবে ঋণগ্রহীতাদের নিয়মিত ঋণ নবায়ন করে যেতে হয় এবং ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য, চলমান বাজার পরিস্থিতি, ঝুঁকি, কর ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে সাথে সুদের হারও তারতম্য হয়। তাই প্রতিবার ঋণ নবায়ন করার সময় সুদের হারও নবায়ন করতে হয়।[৯] যে দেশের সরকারের (বা প্রতিষ্ঠানের) অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত ভালো, সেই দেশের সরকারের সুদের হার তত কম থাকে এবং যে দেশের সরকারের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত খারাপ, সেই দেশে সরকারের সুদের হার তত বেশি থাকে।

টীকা : ব্যাংকারদের সাথে সরকারের মধুর সম্পর্ক ও প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান

ব্যাংকাররা সরকারকে কিছু সুবিধা দেয়, যেমন সঞ্চয়পত্র কেনে, বিপৎকালীন ঋণ প্রদান করে, মন্দার সময় প্রণোদনা দেয় ইত্যাদি। এই সুবিধাগুলোর বিনিময়ে সরকারের থেকে তারা নানা প্রকার সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রথমত, একটি রাষ্ট্রে তারা দেদারচে সুদের কারবার চালাতে পারে। তাছাড়া সরকার নিজেও ব্যাংকগুলোকে সব রকম আইনি সহায়তা প্রদান করে। কেউ যদি ব্যাংক ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, সরকার নিজ হাতে তাকে শায়েস্তা করে। সরকারি স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে লেখা ছাপানো হয়, কিন্তু সুদের কুফল নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না। এমনকি দুর্নীতির দায়ে ব্যাংকগুলো দোষী সাব্যস্ত হলেও লোকদেখানো হালকা শাস্তি দিয়ে 'অর্থনীতির কল্যাণের স্বার্থে' তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাংকারদের সাথে সরকারের এই সখ্য বিশ্বব্যাপী চলছে এবং এর মূল্য দিচ্ছে জনগণ। তাই সরকারকে সব সময় জনগণের বন্ধু বা কল্যাণকামী সত্তা হিসেবে দেখার কিছু নেই। ঋণগ্রস্ত সরকার ঋণদাতাদের দাবি পূরণ করতে জনগণের ওপর যেমন ইচ্ছা তেমন কর আরোপ করতে পারে। এমনকি জনগণের তুলনায় ব্যাংক ব্যবস্থা ও ঋণদাতাদের প্রতি অধিক কল্যাণকামী হতে পারে।

অনেকে দাবি করতে পারে, সরকার যদি জনগণের জন্য সর্বদা কল্যাণকামী সত্তা না হয়, আমাদের ছোটবেলা থেকে সেভাবে বোঝানো হয় কেন? সত্যি কথা বলতে আমাদের স্কুল ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমরা কী বই পড়ব, তা নির্ধারণ করে দেয় সরকার। পরীক্ষার হলে কী প্রশ্ন আসবে, তা-ও নির্ধারণ করে দেয় সরকার। কোন প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখলে আপনি ভালো মার্ক পাবেন, তা-ও নির্ধারণ করে দেয় সরকার। এমন একটি ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তা বলতে

---

৯ কিছু ঋণ থাকে ফ্লোটিং রেটে, অর্থাৎ ঋণ নবায়ন করার আগেই সুদের হার বদলাতে থাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর।

কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। আপনি যদি সরকারের লেখা বই প্রতিদিন পড়েন, সরকারের ছাঁচে তৈরি করা প্রশ্নে পরীক্ষা দেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে ভালো ছাত্র হওয়ার চেষ্টা করেন; খুব বেশি সম্ভাবনা আছে আপনি জ্ঞানী হওয়ার পরিবর্তে আদর্শ দাসে পরিণত হচ্ছেন।

এই কথা শুনে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার উপায় কী এবং একটি রাষ্ট্রের আদর্শ শিক্ষাক্রম কেমন হবে? লক্ষ্য করুন, জ্ঞানকে উন্মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কী পাঠদান করবেন, স্কুলে কোন বই পড়ানো হবে, পরীক্ষায় কী প্রশ্ন আসবে এবং সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে–এগুলোর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অনেকটা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা পরাধীন। একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোন শিক্ষকের কাছে এবং কী বিষয়ে পড়তে যাবে, এই ব্যাপারে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। বর্তমানে দেখা যায়, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এক রুমে বসে থাকি এবং পোষা প্রাণীকে খাবার দেওয়ার মতো একের পর এক শিক্ষক এসে আমাদের জ্ঞান গিলিয়ে যায়। এমনটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক ও পাঠ বাছাই করবে এবং নিজ পছন্দমতো শিখবে (পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ-জাতীয় ব্যবস্থা চালু আছে)। আমাদের ভারতবর্ষে একসময় এমন ব্যবস্থাই চালু ছিল। ছাত্ররা নিজ পছন্দমতো গুরু বাছাই করে তার গৃহে গিয়ে শিখত। এমনকি রাজার ছেলেও গুরুগৃহে গিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মতো থাকত। অর্থাৎ রাজ্যের রাজা শিক্ষকের ওপর অধিকার খাটাত না। সেই তুলনায় উপনিবেশ-পরবর্তী ভারত মহাদেশ পুরোই বদলে গেছে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য সবশেষে যা করা উচিত তা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার কয়েকজন শিক্ষকের থেকে জ্ঞান আহরণ করা। এমনটা করতে পারলে আপনার চিন্তাধারা কয়েক দিকে প্রসারিত হবে এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধ অর্জিত হবে।

'The disabling force of debtwas recognized more clearly in the 18th and 19th centuries (notto mention four thousand years ago in the Bronze Age). This has led pro-creditor economists to exclude the history of economic thoughtfrom the curriculum. Mainstream economics has become censorially pro-creditor, pro-austerity (thatis, anti-labor) and anti-government (exceptfor insisting on the need for taxpayer bailouts of the largestbanks and savers). Yetithas captured Congressional policy, universities and the mass media to broadcasta false map of how economies work. So mostpeople see reality as itis written – and distorted – by the One Percent. Itis a travesty of reality.'

–Michael Hudson

Michael Hudson is an American economist, Professor of Economics at the University of Missouri–Kansas City and a researcher at the Levy Economics Institute at Bard College, former Wall Street analyst and political consultant.

'ঋণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ১৮ এবং ১৯ শতকে আমরা আরও ভালোভাবে অবগত ছিলাম। এজন্য ঋণপন্থি অর্থনীতিবিদেরা পড়াশোনার সিলেবাস থেকে অর্থনীতির ইতিহাস মুছে ফেলেছে। সব মিলিয়ে মূলধারার অর্থনীতি পাঠ হয়ে গেছে ঋণপন্থি, কৃচ্ছ্রনীতিপন্থি এবং সরকারবিরোধী। অর্থনীতি কীভাবে চলে, এই ব্যাপারে একটি ভুল চিত্র তারা কংগ্রেসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মিডিয়াতে প্রচার করে যাচ্ছে। সেজন্য সমাজের বেশির ভাগ মানুষই অর্থনীতি সম্পর্কে শীর্ষ ধনীদের দ্বারা প্রচারকৃত বিকৃত ধারণা নিয়ে বসে আছে। এই বিকৃত ধারণাগুলো বাস্তবতার সাথে তামাশাই বটে।'

–মাইকেল হাডসন

অর্থনীতিবিদ, মিসৌরি-কানসাস সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং বার্ড কলেজের লেভি ইকোনমিকস ইনস্টিটিউটের একজন গবেষক। এই সবকিছুর পাশাপাশি তিনি একজন প্রাক্তন ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা।

রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের কলকবজা

কোনো মুমূর্ষু রোগীকে ডাক্তারের কাছে আনা হলে ডাক্তার তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখেন। মুমূর্ষু রোগীর নাড়ি নামতে নামতে যখন শূন্যে পৌঁছে যায়, রোগী তখন মারা যায়। তেমনি করে কোনো দেশের সরকারের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বিচার করতে সঞ্চয়পত্রে সুদের প্রকৃত হার দেখা হয়। সুদের হার যত বাড়তে থাকে, দেশটি তত বেশি দেউলিয়াত্বের দিকে ঝুঁকতে থাকে। প্রকৃত সুদের হার বাড়তে বাড়তে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছার পর দেশটি দেউলিয়া হয়ে যায়।

দেউলিয়া হওয়ার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে সুদের টাকা দিতে না পারা। সাধারণত কোনো দেশের সরকার সুদের টাকা দেওয়ার মতো ক্যাশ খুঁজে না পেলে তারা ঋণ খোঁজা শুরু করে। কারণ, তারা চায় নতুন ঋণ দিয়ে পুরাতন ঋণের সুদের দায় পূরণ করতে। কিন্তু সরকারের অবস্থা যদি খুব খারাপ হয়ে যায়, ঋণদাতারা সেই সামান্য ঋণটুকুও দিতে রাজি হয় না। এভাবে সুদের টাকা দিতে না পেরে একটি সরকার দেউলিয়া হয়ে যায়।

তবে সাধারণ জনতা কিংবা একটা লিমিটেড কোম্পানির সাথে সরকারের একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে যে সরকারের আয় সীমিত নয়। সরকার চাইলে কর ও শুল্ক বৃদ্ধি করে আয় বাড়াতে পারে। আবার সরকারি সেবা যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন খাতের ফি বৃদ্ধি করেও সরকার আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কিছু কিছু দেশের সরকার, যেমন বাংলাদেশের সরকার পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে একচেটিয়া অধিকার রাখে। এগুলোর দাম বৃদ্ধি করেও মোটা অঙ্কের লাভ হাসিল করা সম্ভব। এককথায় যে দেশের সরকার যত ঋণগ্রস্ত, সেই দেশের সরকারের ওপর রাজস্ব আয়ের চাপ তত বেশি। তারপরও রাজস্ব আদায়ের একটি সীমা আছে। এই সীমায় পৌঁছে গেলে গণ-অসন্তোষ চরমে পৌঁছে এবং রাষ্ট্রকে দেউলিয়াত্ব বরণ করতে হয়।

আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিশটি দেশের তালিকা। এদের প্রায় সবার মোট ঋণের পরিমাণ এবং

সঞ্চয়পত্রে সুদের হার অত্যন্ত বেশি। আরও লক্ষ্য করুন, তারা তাদের মোট জিডিপির বড় একটি অংশ সুদ পূরণের পেছনে ব্যয় করছে। একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারের বাজেট সাধারণত জিডিপির ১৫ শতাংশ হয়। সেই হিসাবে কোনো দেশ যদি জিডিপির ৫ শতাংশ সুদে ব্যয় করে, বলা চলে বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ সুদের পেছনে ব্যয় হচ্ছে! সত্যি কথা বলতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অবস্থাও এই ব্যাপারে খুব একটা ভালো নয়। বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ সুদে ব্যয় করে।

দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি-সম্পন্ন দেশের তালিকা	সরকারি সঞ্চয়পত্রের সুদের হার	মোট জিডিপির উপর শতকরা হারে সুদের ব্যয়	মোট জিডিপির উপর শতকরা হারে সরকারি ঋণ
এল সালভাডর	৩১.৮%	৪.৯%	৮২.৬%
ঘানা	১৭.১%	৭.২%	৮৪.৬%
তিউনিসিয়া	৩২.১%	৩.০%	৮৭.৩%
পাকিস্তান	১৬.৮%	৪.৮%	৭১.৩%
মিসর	১৩.২%	৮.২%	৯৪.০%
কেনিয়া	১৪.৬%	৪.৪%	৭০.৩%
আর্জেন্টিনা	২০.৭%	১.৭%	৭৪.৩%
ইউক্রেইন	৬০.৪%	২.৯%	৪৯.০%
বাহরাইন	৬.৬%	৪.৫%	১১৬.৫%
নামিবিয়া	৯.৪%	৪.২%	৬৯.৬%
ব্রাজিল	৬.০%	৭.২%	৯১.৯%
এংগোলা	১২.০%	৪.০%	৫৭.৯%
সেনেগাল	১০.২%	২.১%	৭৫.৩%
রুয়ান্ডা	৮.৯%	২.৫%	৭২.০%
সাউথ আফ্রিকা	৭.৩%	৪.৭%	৭০.২%
কোস্টা রিকা	৭.৬%	৫.২%	৬৯.৪%
গেবন	১১.৭%	২.৪%	৫৭.৪%
মরক্কো	৭.৩%	২.৪%	৭৭.১%
ইকুয়েডর	১৩.৩%	১.৩%	৬২.২%
তুরস্ক	১০.১%	৩.০%	৪৩.৭%

চিত্র : রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিশটি দেশের তালিকা–ব্লুমবার্গ

এবার বুঝলেন, কেন দফায় দফায় কোনো কারণ ছাড়াই সরকারি সেবা, যেমন বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাসের দাম বেড়েই যাচ্ছে? 'আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী, কোনো সমস্যা নেই'–এ রকম বার্তা দেওয়ার পরও কেন দফায় দফায় বৈদেশিক ঋণের জন্য বিপুল বিক্রমে আয়োজন চলছে? এটাই যে পড়তি অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার মূলমন্ত্র ও খেলাপি ঋণ সময় নিয়ে শোধ করার খুব ভালো পন্থা। আহ্! (আরেকটা গভীর বিষাদের দীর্ঘশ্বাস আর নাস্তা খেয়ে হালকা গরম চায়ে হতাশাজনক চুমুক দিয়ে রুমের ভেতর কিছুক্ষণ অস্থিরচিত্তে পায়চারি করা...)

রাষ্ট্র দেউলিয়া হলে অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়ে?

১। সরকার একাধারে জনগণ, ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিদেশি সংস্থাগুলোর কাছে ঋণী থাকে। তাই সরকার যখন দেউলিয়া হয়, বিপুল অঙ্কের টাকা Bad Debt (খেলাপি ঋণ) হয়ে যায়। এত টাকার ঋণ খেলাপি হয়ে গেলে সবগুলো ব্যাংকের অবস্থা একসাথে খারাপ হয়ে যায়, যা ফাইন্যান্সিয়াল বিশ্বের জন্য অশনিসংকেত।

২। সরকার যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, ব্যাংকগুলোর পুঁজি সংকুচিত হয়ে আসে। একটি ব্যাংক কী পরিমাণ ঋণ ইস্যু করতে পারবে, তার বিপরীতে পুঁজির একটি ন্যূনতম সীমা থাকে। সমস্যা হচ্ছে সরকার যেহেতু অনেকগুলো ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে থাকে, সে দেউলিয়া হয়ে গেলে অনেকগুলো ব্যাংকের পুঁজি সংকুচিত হয়ে আসে। এতে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ ইস্যু করতে পারে না। এভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে আসে।

৩। অর্থনৈতিক সংকটকালে ব্যাংকগুলো ঋণ ইস্যু করতে না পারলে অর্থনীতিতে নতুন টাকা তৈরি হয় না। তাই পুরাতন ঋণের দায় সুদে-আসলে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেউলিয়াত্ব ছড়িয়ে পড়ে।

৪। সরকার দেউলিয়া হলে জনগণের ভোগব্যয়ও কমে আসে। দেউলিয়া দেশের জনগণের হাতে থাকা সঞ্চয়পত্রগুলোর মূল্যমান কমে আসে। এর ফলে মানুষের হাতে হাতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও কমে আসে।

৫। সঞ্চয়ের মূল্যমান কমে গেলে আপনি আগের সমান ব্যয় করতে পারেন না। ধরুন, একটি ব্যাংকে আপনার ১ কোটি টাকা সঞ্চয় আছে। হঠাৎ করে আপনি জানতে পারলেন, ব্যাংকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। আবার মনে করুন, আপনি ১ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র কেনার কিছুদিনের মাথায় সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে আপনার ব্যয়ের ধাঁচেও পরিবর্তন আসবে। এভাবে সমাজের অনেকে ব্যয় কমিয়ে দিলে সমগ্র অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে পড়বে।

৬। সরকার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সাথে ফাইন্যান্সিয়াল বিশ্বে শক ওয়েভ শুরু হয়ে যায়। দেউলিয়া দেশের মুদ্রামান পড়ে যায় এবং ব্যাংকিং খাত দুর্বল হয়ে যায়। পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেলে অনেকেই ব্যাংকের থেকে টাকা তুলতে দৌড় দেয়। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে ব্যাংকে যে পরিমাণ ডিপজিট থাকে, তার সমপরিমাণ টাকা সিন্দুকে জমা থাকে না। তাই সবাই যখন একসাথে টাকা তুলতে দৌড় দেয়, ব্যাংক তখন দরজা বন্ধ করে দেয়। অর্থনীতির সংকটকালে ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার এ-জাতীয় ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে ব্যাংক হলিডে। অনেক সময় ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কেবল সামান্য পরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি দেয়। এর ফলে মুদ্রাসংকট ও মন্দা তীব্র আকার ধারণ করে।

৭। সরকার দেউলিয়া হওয়া মানে সামনের বছরগুলোতে বাজেটে খুব কম টাকা ব্যয় হওয়া। সরকার কম অর্থ ব্যয় করলে দেশের উন্নয়ন হয় কম। এজন্য সরকার দেউলিয়া হলে একই সাথে ব্যবসা বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীদের কর্তৃক ঋণ নেওয়ার পরিমাণ কমে যায়। যেহেতু ঋণ নেওয়া কমে গেলে নতুন টাকা তৈরি হওয়া কমে আসে। সরকার দেউলিয়া হলে একটি দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও দেউলিয়া হওয়া শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে।

৮। সবশেষে সরকারি দেউলিয়াত্ব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের মতো নয়। একজন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে যেমন তার সম্পদ জব্দ করে ঋণের ক্ষতি উশুল করা হয়, তেমনি করে সকল সরকারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ঋণ উশুল করার ব্যবস্থা নেই। তাই দেখা

যায় সরকার দেউলিয়া হলে ঋণদাতা এবং সরকার মিলে সমঝোতা করে। ঋণদাতারা চায় যথাসম্ভব বেশি টাকা আদায় করতে এবং সরকার চায় যথাসম্ভব কম টাকা দিয়ে বাঁচতে। সরকার অনেক সময় টাকা ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধ করা শুরু করে, যা হাইপার ইনফ্লেশন তৈরি করে। এজন্য কোনো দেশের সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলে সেই দেশের টাকার মান পড়ে যায় এবং নতুন ঋণদাতারা ভয়েও সেই দেশের কাছে আসতে চায় না।[১০]

১০ ঋণ যদি বিদেশি মুদ্রায় হয়ে থাকে, টাকা ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে গেলে চরম মূল্য দিতে হয় (একমাত্র আমেরিকাকে এই ঝামেলা পোহাতে হয় না)। বহু দেশ এভাবে ঋণের চক্রে পড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় মনেটারি পলিসি কীভাবে কাজ করে

খুব সহজ বাংলায় আমরা বলতে পারি, মনেটারি পলিসি হচ্ছে সুদের হার (বা মোট টাকার পরিমাণ) হ্রাস-বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করার চেষ্টা।

আধুনিক অর্থনীতিতে মনেটারি পলিসিসংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত সুদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তার একটি কারণ হচ্ছে বর্তমানে আমরা যে অর্থব্যবস্থায় বাস করি, তা ঋণভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এখানে ঋণ বিনে কোনো টাকা নেই। তাই বড় ব্যবসা গড়া, কলকারখানা নির্মাণ করা, ফ্ল্যাটবাড়ি কেনা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের ঋণ নিতে হয়। ঋণ (বা ক্রেডিট) হচ্ছে টাকা তৈরির প্রধান উৎস এবং বিনিয়োগের অন্যতম হাতিয়ার। তাই যে অর্থনীতিতে ঋণ পাওয়া যত সহজ, সেই অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ তত বেশি। সেজন্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে সুদের হার কমিয়ে ঋণ নেওয়াকে সহজ করে দেওয়া হয়। একটা উদাহরণ দিই, মনে করেন, একটি মুরগির ফার্ম দিতে আপনি ব্যাংকের কাছে ঋণ নিতে গেলেন। সাধারণত মুরগির খামার করলে একশো টাকায় দশ টাকা লাভ হয় আপনার। কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, একশো টাকা ঋণ নিলে আপনাকে ১২ টাকা সুদ দিতে হবে। এমতাবস্থায় ঋণের টাকায় মুরগির খামার করা লাভজনক হবে না অবশ্যই। কিন্তু আপনি যদি দেখেন বাজারে সুদের হার একশো টাকায় আট টাকা, সে ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে মুরগির খামার করলে আপনি শতে দুই টাকা লাভ করতে পারবেন। অর্থাৎ সুদের হার কমলে বিনিয়োগ করা লাভজনক হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়।

আরেকভাবে বিষয়টি চিন্তা করা যায়। ধরি, একজন ব্যবসায়ীর হাতে ১ কোটি টাকা আছে। তিনি মাছ চাষ করবেন। মাছ চাষ করলে একশো টাকায় নয় টাকা লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখলে একশো টাকায় দশ

টাকা সুদ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই মাছ চাষ করবেন না। কিন্তু যদি এমন হয় যে ব্যাংকে টাকা রাখলে একশো টাকায় আট টাকা সুদ পাওয়া যায়, তাহলে মাছ চাষ করলে তিনি বেশি লাভবান হবেন। তাই সুদের হার কমিয়ে আনলে অনেক বেশি ব্যবসা সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।

ওপরের উদাহরণে সুদের হার ৮% থেকে কমিয়ে যদি ৫% করে দেওয়া হয়, আরও বেশি ব্যবসা বিনিয়োগের উপযোগী হয়ে উঠবে। তখন মানুষ ব্যাংক থেকে প্রচুর ঋণ নেবে, বেশি বেশি বিনিয়োগ করবে এবং অর্থনীতিও আকারে বড় হবে। সব মিলিয়ে সুদের হার কমালে বিনিয়োগ এবং ব্যবসা দ্রুত প্রসার হবে।

টীকা : প্রকৃত সুদের হার

জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতো সুদের হারও দুই প্রকার।

১। Nominal (বা কাগজে-কলমে) সুদের হার এবং ২। Real (বা প্রকৃত) সুদের হার

সাধারণত সুদের হার বলতে আমরা Nominal (বা কাগজে-কলমে) সুদের হারকেই বোঝাই। খবরের কাগজে, বিজ্ঞাপনে, টিভিতে, নোটিশ বোর্ডে; এককথায় সবখানে আমরা নমিনাল সুদের হার দেখে থাকি। নমিনাল সুদের হার মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ হচ্ছে প্রকৃত সুদ এবং অপর অংশ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। নমিনাল সুদের হারের থেকে মূল্যস্ফীতি বিয়োগ করলে আমরা প্রকৃত সুদের হার পেয়ে থাকি। মূল্যস্ফীতি যদি শূন্য বা তার কাছাকাছি হয়ে থাকে, নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট ধারণাটি মোটামুটি কাজে দেয়। কিন্তু যে সকল দেশে মূল্যস্ফীতি শূন্যের কাছাকাছি নয়, সেই সকল দেশে নমিনাল ইন্টারেস্ট ধারণাটি খুব একটা কাজের নয়। ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনাকে মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। ধরুন, কোনো দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলে আপনি আমানতের বিপরীতে ৫% সুদ পান। কিন্তু সেই দেশে গড় মূল্যস্ফীতি ১০%। এর অর্থ হচ্ছে ব্যাংকে টাকা রাখলে আপনি দিন দিন গরিব হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দেশটিতে মূল্যস্ফীতি যদি ১% হতো, ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতিবছর আপনার সম্পদ চার শতাংশ করে বৃদ্ধি পেত। আপনারা হয়তো জানেন যে একটি দেশে মূল্যস্ফীতি ঋণাত্মকও হতে পারে; ইংরেজিতে যাকে বলে deflation। মূল্যস্ফীতি যদি ঋণাত্মক হতো, যেমন -২% এবং আমানতের বিপরীতে সুদের হার ৫% হতো, ব্যাংকে টাকা রাখলে আপনার সম্পদ বছরে ৭% করে বেড়ে যেত।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রকৃত সুদের হার মোটামুটি স্থির থাকে। কেবল মূল্যস্ফীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে নমিনাল সুদের হারে পরিবর্তন দেখা যায়। অঙ্ক কষে হিসাবটি আরেকবার বোঝা যাক। ধরি, আন্তর্জাতিকভাবে প্রকৃত সুদের হার ২ শতাংশে স্থির। রাষ্ট্র 'ক'তে মূল্যস্ফীতি ৩ শতাংশ, রাষ্ট্র 'খ'তে মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশ এবং রাষ্ট্র 'গ'তে মূল্যস্ফীতি -১ শতাংশে চলমান; তাহলে রাষ্ট্র 'ক'তে সুদের বাজারদর হবে ৫%, রাষ্ট্র 'খ'তে সুদের বাজারদর হবে ১৭% এবং রাষ্ট্র 'গ'তে সুদের বাজারদর হবে ১%। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও সুদের বাজারদর হাতে হাত ধরে চলে। সেই হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপালে সুদের বাজারদর বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কমে কেন? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির উত্তরে লুকিয়ে আছে আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার জরুরি জ্ঞান।

বাকি সবকিছু আগের মতো থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন টাকা ছাপায়, তখন মূল্যস্ফীতি বাড়ে, কিন্তু সুদের হার কমে। এই বৈপরীত্য বুঝতে টাকা ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী করে, তা খেয়াল করুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে বন্ড কেনে। এদিকে অন্য সবকিছু আগের মতো থাকলে কোনো বস্তুর চাহিদা বাড়লে তার দাম বেড়ে যায়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে বন্ড কেনা শুরু করলে বন্ডের দাম বেড়ে যায় এবং সুদের হার কমে যায়। সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতির কারণে সুদের হার বাড়ার কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এত বেশি সঞ্চয়পত্র কেনে যে মোট সুদের হার কমে যায়।

একটি স্বাভাবিক দেশে সবচেয়ে নিরাপদ ঋণ গ্রহণকারী সংস্থা হচ্ছে সরকার। সেজন্য এই ঋণের সুদের হারকে ফাইন্যান্সের পরিভাষায় Risk Free Interest Rate বলে।[১১] যেহেতু সরকারি ঋণ প্রায় ঝুঁকিবিহীন, এই ঋণে সুদের হার হয় সর্বনিম্ন। অন্য সকল ঋণের সুদের হার সরকারি ঋণের সুদের হারের সাথে বাড়তি হিসেবে যুক্ত হয়। কারণ, সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঋণে সরকারের তুলনায় বাড়তি ঝুঁকি থাকে। তাই তাদের ঋণের সুদের হার সরকারকে দেওয়া ঋণের তুলনায় বেশি হয়। এক্ষেত্রে যার ঝুঁকি যত বেশি হবে, তার ঋণের সুদের হার তত বেশি হবে। তাই সরকারের তুলনায় একটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কত বেশি, তা নির্ণয় করতে পারলে আমরা সহজেই বলে দিতে পারব সেই প্রতিষ্ঠানকে কোনো সুদের হারে আমরা ঋণ দিতে পারব। এবার চিন্তা করে দেখেন, একটি দেশের সরকার বর্তমানে ১০ শতাংশ হারে সুদ নিচ্ছে। এমন যদি হয় যে কপোতাক্ষ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি সরকারি ঋণের তুলনায় দেড় গুণ, তাহলে তার সুদের হার হবে ১৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

---

১১ প্রকৃতপক্ষে সরকারকে দেওয়া ঋণ সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও সরকারি ঋণকে ঐতিহাসিকভাবে ঝুঁকিমুক্ত ঋণ বলা হয়ে থাকে।

গণহারে সঞ্চয়পত্র কেনা শুরু করলে সরকারি ঋণে সুদের হার কমে আসতে থাকবে। যেহেতু সরকারি ঋণে সুদের হারের সাথে মিলিয়ে অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঋণে সুদের হার নির্ধারণ করা হয়, যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে (বা Expansionary Monetary Policy দ্বারা) সঞ্চয়পত্র কিনবে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুদের হার কমে আসবে।

দ্বিতীয় একটি বিষয় হচ্ছে যারা সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে, তাদের একেকজনের অ্যাকাউন্ট এক এক ব্যাংকে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়পত্র কিনতে থাকলে প্রতিটি ব্যাংকের হাতে থাকা টাকার পরিমাণ বাড়তে থাকে। একটু আগে বলেছিলাম, একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকার সংকট থাকলে অপর বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে উভয় ব্যাংকের হাতেই অতিরিক্ত টাকা আছে? তখন এদের দুজন একজন আরেকজনের থেকে টাকা চাইবে না। এভাবে প্রতিটি ব্যাংকের হাতে হাতে বাড়তি টাকা থাকলে (ব্যাংকিং সিস্টেমে অধিক তারল্য থাকলে) অর্থনীতিতে সকল সুদের হার কমে যেতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে সুদের হার ছিল ১২%। এই ১২% সুদের হারে সবাই ঋণ নিত এবং কারও হাতে অলস টাকা থাকত না। কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেমে অধিক টাকা প্রবেশ করায় ১২% সুদের হারে যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়, তার তুলনায় বেশি টাকা অলস পড়ে থাকে। বাজারে কোনো পণ্য বাড়তি থাকলে যেমন সেই পণ্যের বাজারদর পড়ে যায়, ঠিক তেমনি, ব্যাংকগুলোর হাতে বাড়তি টাকা থাকলে সুদের বাজারদরও পড়ে যায়। তাই এখন যদি কেউ ঋণ নিতে আসে বর্তমানে সঞ্চয়পত্রের বাজারদর + রিস্ক প্রিমিয়াম মিলে আগের তুলনায় কম সুদের হারে ঋণ দেওয়া সম্ভব হবে। এভাবে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ নিয়ে ব্যবসা ও বিনিয়োগ করা সহজ হয়ে যাবে। সাদাচোখে এই হচ্ছে সরল হিসাব।

এখন চিন্তা করে দেখেন, কোনো দেশে অর্থনৈতিক সংকট লাগলে প্রথমে করণীয় কী? কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মানি সাপ্লাই বৃদ্ধি করে সুদের পলিসি রেট কমানো।[১২] সঞ্চয়পত্র কিনে, ঋণ দিয়ে বা আরও বিভিন্ন উপায়ে (যেমন Quantitative Easing) বাজারে বাড়তি টাকা ছেড়ে সুদের হার কমানো এবং সম্পদের দাম বাড়ানো হয়। এভাবে অর্থনীতিকে চাঙা করার চেষ্টা করা হয়।

মনেটারি পলিসির একটি সমস্যা হচ্ছে এর ক্ষণস্থায়িত্ব। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ড কেনা বন্ধ করলে অল্প সুদের হারের জাদু ম্লান হতে থাকে। এজন্য

---

১২ মূলত বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চলমান আন্তসুদের হার বা কল মানি রেটই হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের পলিসি রেট।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা করে তা হচ্ছে ক্রমাগত সঞ্চয়পত্র কেনা। কারণ, ক্রমাগত সঞ্চয়পত্র কিনতে থাকলে অনবরত পরিস্থিতি বদলাতে থাকে এবং একপর্যায়ের সাথে খাপ খাওয়াতে না খাওয়াতেই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকে। এভাবে দীর্ঘদিন সুদের হার কৃত্রিম উপায়ে কম রাখা সম্ভব হয়।

এই পর্যন্ত আলোচনা শেষে মনে হতে পারে, সুদের হার কম রাখাটাই সোনার হরিণ। সবাই সুদের হার কমিয়ে জিডিপি বৃদ্ধি করে ফেললেই পারে। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন যে মনেটারি পলিসি অর্থনৈতিক উৎপাদনের কোনো নিয়ামক নয়। সুদের হার কমাতে প্রচুর টাকা ছাপাতে হয় এবং নতুন ছাপানো টাকা ঋণ দিয়ে সুদের হার কৃত্রিম উপায়ে কম রাখা হয়।

মনে করেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক বেশি টাকা ছাপাচ্ছে। টাকা ছাপিয়ে সে যে সকল বস্তু কিনবে, সেগুলোর দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং তার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে মূল্যস্ফীতিও। ধরাযাক বর্তমানে প্রকৃত সুদের হার ২% এবং মূল্যস্ফীতি ৩%; অর্থাৎ, মোট সুদের হার ৫%। এখন মূল্যস্ফীতি বেড়ে যদি ৩% থেকে ৫% হয়, মোট সুদের হার দীর্ঘ মেয়াদে বেড়ে ৬% থেকে ৮% হয়ে যাবে। কিন্তু স্বল্প মেয়াদে সুদের হার একলাফে ৬% থেকে ৮% হয় না। কিছুদিন একটু কম থাকে। তার কারণ হচ্ছে, বাজারে টাকা ছাড়ার সাথে সাথে মূল্যস্ফীতি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় না। নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে আমাদের কিছু সময় লাগে। এই সময়ের মাঝে সুদের হার কৃত্রিমভাবে কম থাকে এবং জিডিপিও কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন, একটি দেশে সুদের হার ২০%। আরেকটি দেশে সুদের হার ৩%। এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশটি এগিয়ে? একবাক্যে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ধরুন, যে দেশে সুদের হার ২০%, সেই দেশে মূল্যস্ফীতি ১৮% এবং যে দেশে সুদের হার ৩%, সেই দেশে মূল্যস্ফীতি ১%। তার মানে উভয় দেশে প্রকৃত সুদের হার একই।

সবশেষে যে দেশে মোট সুদের হার বেশি, সেই দেশে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে ফেলেও রাতারাতি সব বদলে ফেলা যাবে না। মনে করেন, একটি দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ১৮%, তা কমিয়ে ১% করে দেওয়া হলো। 'বাজার প্রতিযোগিতামূলক থাকলে' মোট সুদের হার একসময় ৩% হয়ে যাবে। কারণ, এমনটা না করলে কিছুদিনের মাঝে ব্যাংকগুলো প্রতিযোগিতা করে সুদের হার নামিয়ে ফেলবে।

তবে মনেটারি পলিসি কেবল সংকটকালে চর্চা করা হয়। কারণ, সংকটকালে অর্থনীতি এমনিতেই ডাউন হয়ে থাকে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্ফীত মুদ্রানীতি (Expansionary Monetary Policy) নিলে কোনো সমস্যা

হয় না। সংকট কেটে যেতে থাকলে অর্থনীতিতে তীব্র মূল্যস্ফীতি শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন টাকার পরিমাণ কমিয়ে আনে (Contractionary Monetary Policy)। সব মিলিয়ে স্ফীত মুদ্রানীতির কল্যাণে যে বাড়তি উৎপাদন হয়েছিল, সংকুচিত মুদ্রানীতিতে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তা শেষ হয়ে যায়। এককথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনেটারি পলিসি করুক কিংবা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করুক, দীর্ঘ মেয়াদে ফলাফল একই থাকে।

It is production that creates purchasing power, not the printing press

— Peter Schiff

American stock broker, financial commentator, and radio personality. He is CEO and chief global strategist of Euro Pacific Capital Inc.

উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা তৈরি হয়। টাকা ছাপানোর মাধ্যমে নয়।

— পিটার শিফ

আমেরিকান স্টক ব্রোকার, অর্থনৈতিক ভাষ্যকার এবং রেডিও ব্যক্তিত্ব। তিনি ইয়োরো প্যাসিফিক ক্যাপিটাল ইনকরপোরেটেডের সিইও এবং প্রধান বৈশ্বিক কৌশলবিদ।

টীকা

Quantitative Easing বা সংখ্যাগত সহজতা

ঐতিহ্যবাহীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল নিরাপদ সঞ্চয়পত্র (সরকারি সঞ্চয়পত্র) কিনে বাজারে টাকা প্রবেশ করাত। বিভিন্ন করপোরেশনের শেয়ার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়পত্র, বাড়িঘরের ঋণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনত না। তবে ২০০৭-০৮ সালের মন্দার সময় থেকে বিষয়গুলোতে বেশ বড় পরিবর্তন আসতে থাকে। প্রাইভেট মার্কেটেও আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ হস্তক্ষেপ করতে থাকে। প্রথমে তারা গৃহ ঋণ কিনতে থাকে ব্যাপক হারে, তারপরে করপোরেট ঋণ কেনাও শুরু করে। এতটুকু পর্যন্ত একটি পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সবার টনক নড়ে যখন ফেডারেল রিজার্ভ কোম্পানির শেয়ার কেনা শুরু করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন চেয়ারম্যান বেন বার্নাঙ্কি এই ব্যাপারে সর্ব প্রথম Quantitative Easing (কোয়ান্টেটেটিভ ইজিং) শব্দটির প্রচলন করে। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচলিত ধারার থেকে বের হয়ে একাধারে সরকারি বন্ড, বেসরকারি বন্ড, গৃহঋণ, কোম্পানির শেয়ার ইত্যাদি কিনে ব্যাপক হারে বাজারে টাকা প্রবেশ করানো এবং সবকিছুর দাম বাড়ানোতে সাহায্য করা। (করোনা সংকটের সময় থেকে ফেডারেল রিজার্ভ জাঙ্ক বন্ড কেনাও শুরু করে।)

পুরাতন ঋণের আসল শোধ করে এবং সুদ প্রদানের ধারা চালিয়ে যায়। এভাবে ঋণগ্রহীতাদের নিয়মিত ঋণ নবায়ন করে যেতে হয় এবং ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য, চলমান বাজার পরিস্থিতি, ঝুঁকি, কর ইত্যাদির পরিবর্তনের সাথে সাথে সুদের হারও তারতম্য হয়। তাই প্রতিবার ঋণ নবায়ন করার সময় সুদের হারও নবায়ন করতে হয়।[৯] যে দেশের সরকারের (বা প্রতিষ্ঠানের) অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত ভালো, সেই দেশের সরকারের সুদের হার তত কম থাকে এবং যে দেশের সরকারের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত খারাপ, সেই দেশে সরকারের সুদের হার তত বেশি থাকে।

টীকা : ব্যাংকারদের সাথে সরকারের মধুর সম্পর্ক ও প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান

ব্যাংকাররা সরকারকে কিছু সুবিধা দেয়, যেমন সঞ্চয়পত্র কেনে, বিপৎকালীন ঋণ প্রদান করে, মন্দার সময় প্রণোদনা দেয় ইত্যাদি। এই সুবিধাগুলোর বিনিময়ে সরকারের থেকে তারা নানা প্রকার সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রথমত, একটি রাষ্ট্রে তারা দেদারচে সুদের কারবার চালাতে পারে। তাছাড়া সরকার নিজেও ব্যাংকগুলোকে সব রকম আইনি সহায়তা প্রদান করে। কেউ যদি ব্যাংক ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, সরকার নিজ হাতে তাকে শায়েস্তা করে। সরকারি স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে লেখা ছাপানো হয়, কিন্তু সুদের কুফল নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না। এমনকি দুর্নীতির দায়ে ব্যাংকগুলো দোষী সাব্যস্ত হলেও লোকদেখানো হালকা শাস্তি দিয়ে 'অর্থনীতির কল্যাণের স্বার্থে' তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাংকারদের সাথে সরকারের এই সখ্য বিশ্বব্যাপী চলছে এবং এর মূল্য দিচ্ছে জনগণ। তাই সরকারকে সব সময় জনগণের বন্ধু বা কল্যাণকামী সত্তা হিসেবে দেখার কিছু নেই। ঋণগ্রস্ত সরকার ঋণদাতাদের দাবি পূরণ করতে জনগণের ওপর যেমন ইচ্ছা তেমন কর আরোপ করতে পারে। এমনকি জনগণের তুলনায় ব্যাংক ব্যবস্থা ও ঋণদাতাদের প্রতি অধিক কল্যাণকামী হতে পারে।

অনেকে দাবি করতে পারে, সরকার যদি জনগণের জন্য সর্বদা কল্যাণকামী সত্তা না হয়, আমাদের ছোটবেলা থেকে সেভাবে বোঝানো হয় কেন? সত্যি কথা বলতে আমাদের স্কুল ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমরা কী বই পড়ব, তা নির্ধারণ করে দেয় সরকার। পরীক্ষার হলে কী প্রশ্ন আসবে, তা-ও নির্ধারণ করে দেয় সরকার। কোন প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখলে আপনি ভালো মার্ক পাবেন, তা-ও নির্ধারণ করে দেয় সরকার। এমন একটি ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তা বলতে

---

৯ কিছু ঋণ থাকে ফ্লোটিং রেটে, অর্থাৎ ঋণ নবায়ন করার আগেই সুদের হার বদলাতে থাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর।

ব্যাংক ব্যবস্থাকে সহায়তা করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও মনেটারি পলিসি দ্বারা সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্যাংক একটি ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সে সামান্য কিছু টাকা সিন্দুকে রেখে বাকি সব টাকা ঋণ হিসাবে দিয়ে দেয়। তাই সবাই একসাথে টাকা তুলতে এলে ব্যাংক প্রমাদ গুনবে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত এক ব্যাংক অপর ব্যাংকের কাছে টাকা খোঁজে। মনে করুন, আজ শীতলক্ষ্যা ব্যাংকে টাকার সংকট, ওদিকে বুড়িগঙ্গা ব্যাংকে বাড়তি টাকা আছে। শীতলক্ষ্যা ব্যাংক তখন বুড়িগঙ্গা ব্যাংকের থেকে টাকা খুঁজে গ্রাহকদের চাহিদা মেটাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্র নিজেই যদি দেউলিয়াত্বের মুখে পড়ে, সব ব্যাংকের গ্রাহকই টাকা তুলতে ব্যাংকে ভিড় করে। তখন একসাথে সব ব্যাংকে টাকার টান পড়ে। এতে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করে (আগেই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে অন্য সকল ব্যাংকের অভিভাবক)। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে ব্যাংক হলিডে। তারল্যসংকটে পড়া রাষ্ট্রে মোট টাকা উত্তোলনের ওপরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে টাকা ছাপিয়ে সরাসরি ঋণ প্রদান করা হয়। এভাবে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে ব্যাংকিং সিস্টেমকে সাহায্য করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থার উপকারের জন্য কিংবা মূল্যস্ফীতি কমাতে বাজার থেকে টাকা তুলে ফেলা দরকার পড়লে তা-ও করতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মনে করেন, এই বছর আমি নব্বই হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয়পত্র কিনলাম। কিন্তু তার পরের বছর অর্থনীতিতে তারল্য উদ্বৃত্তি দেখা

দিল। তখন কী করতে হবে? টাকা তুলে ফেলতে হবে। তাই না? ঠিক তাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চয়ই মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা ছিনতাই করবে না। বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার বিশেষ একটি কায়দা আছে। যে উপায়ে বাজারে টাকা প্রবেশ করানো হয়, ঠিক তার বিপরীত উপায়ে বাজার থেকে টাকা তুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ হাতে থাকা সঞ্চয়পত্রগুলো ধীরে ধীরে বিক্রি করা শুরু করে তারা। মনে করি, পদ্মা গ্রুপের সঞ্চয়পত্র কেনা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে গিয়ে বলল, 'এই নিন।' কিছুক্ষণ পরে আরেকজন সঞ্চয়পত্র কিনতে এলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার বলল, 'এই নিন। আমার থেকে কিনুন।' এভাবে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করতে থাকলে কী হবে? প্রথমত, বাজার থেকে টাকা গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিন্দুকে জমা হতে থাকবে বা অর্থনীতিতে মোট টাকার পরিমাণ কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়পত্রে সুদের হার বেড়ে যাবে। কারণ, কোনো বস্তুর সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে এবং অপরাপর বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকলে বস্তুটির দাম কমে যায়। সেই হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন খোলাবাজারে গণহারে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করা শুরু করবে, তখন সঞ্চয়পত্রের দামও কমে যেতে থাকবে। অর্থনীতির ছাত্ররা ভালো করেই জানেন যে সঞ্চয়পত্রের দাম এবং সুদের হার বিপরীতমুখী। অর্থাৎ সঞ্চয়পত্রের দাম বাড়া মানে সুদের হার কমা এবং সুদের হার কমা মানে সঞ্চয়পত্রের দাম বাড়া। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার সাথে সাথে সরকারি ঋণে সুদের হার বেড়ে যেতে থাকে।

এভাবে সঞ্চয়পত্র কেনার মাধ্যমে অর্থনীতিতে মোট টাকার পরিমাণ ও সুদের বাজারদর কম-বেশি হতে থাকে।

দেউলিয়াত্ব মোকাবিলায় মনেটারি পলিসি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনেটারি পলিসি দ্বারা দেউলিয়াত্ব মোকাবিলা করা সম্ভব। আমরা দেখেছি যে সরকারি সঞ্চয়পত্রে সুদের হার যদি বেড়ে যায়, দেউলিয়াত্ব দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। তাই বিপদগ্রস্ত সরকারকে বাঁচানোর একটি পদ্ধতি হচ্ছে সুদের হার কমিয়ে ফেলা। বিষয়টি কীভাবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করা যাক।

আমরা জানি, বাকি সবকিছু আগের মতো থাকলে একটি বস্তুর চাহিদা যত বাড়ে, তার দামও তত বাড়ে। সেই সূত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাজারে প্রবেশ করে ডানে-বাঁয়ে সবার থেকে বন্ড কেনা শুরু করে (সজল দাদুর গল্প মনে আছে?), তখন বন্ডের দামও বেড়ে যেতে থাকে। অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের ছাত্ররা নিশ্চয়ই জানেন যে বন্ডের দাম এবং সুদের হার বিপরীতমুখী। তাই সঞ্চয়পত্রের দাম যত বেড়ে যায়, সুদের হার তত কমে যায়। দেউলিয়াত্বের মুখে পড়া সরকার সুদের হার কমে যেতে দেখলে খুবই খুশি হয়। কারণ, এভাবে তার জন্য পুরাতন ঋণ নবায়ন করা সহজ হয়ে যায় এবং দিনে দিনে মোট সুদের বোঝা কমতে থাকে। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদার মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি দূর হতে থাকে।

তবে এই কথা মনে রাখা আবশ্যক যে ব্যাংক ব্যবস্থা সরকারকে বিনা মূল্যে লাইফ সাপোর্ট দেয় না। তারা ঋণ ও সুদের চক্র চালিয়েই লাইফ সাপোর্ট দেয়। আর এই কথাও ভুলে যাওয়া যাবে না যে তাদের তৈরি করা অন্যায্য সিস্টেমের শিকার হয়েই সরকার দেউলিয়া হয়। তাছাড়া সরকারের পূর্বঋণও ব্যাংক ব্যবস্থা ক্ষমা করে না। মনেটারি পলিসি কেবল বেশি ঋণ নেওয়াকে সাময়িকভাবে সহজ করে দেয়। একবার বেশি ঋণ গিলিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থা যদি সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, সরকার সাথে সাথে দেউলিয়া হয়ে যায়। বলা যায়, ব্যাংকাররা ছুরির মুখেই সরকারকে লাইফ সাপোর্টে রাখে।[১৩]

---

১৩ সুদের হার কম রাখলে কেবল সরকার নয়, সর্ব ক্ষেত্রেই মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই সুদের হার কমিয়ে অর্থনীতিতে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পর আবার সুদের হার বাড়ালে একের পর এক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হতে থাকে এবং তাদের সম্পদ ব্যাংকে ব্যবস্থার হাতে কবজা হতে থাকে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা মোকাবিলায় ফিসকাল পলিসি কীভাবে কাজ করে

অর্থনৈতিক দুরবস্থা মোকাবিলায় সরকার যদি নিজেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাকে বলে ফিসকাল পলিসি। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা। উভয়ের কাজের ধরন এবং গ্রাহক প্রকৃতিও আলাদা। সরকারের মূল গ্রাহক হচ্ছে জনগণ। তাই জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতেই সরকার কাজ করে যায়। অপর পক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল গ্রাহক হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক। তাই একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কল্যাণ নিশ্চিত করতে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে।

ফিসকাল পলিসি নিয়ে আলোচনা করার সময় একটি বিষয় মাথায় রাখবেন। সরকার চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো টাকা ছাপাতে পারে না। সবার আয় কম হলে সরকারের আয়ও কমে আসে। কারণ, আয় কমে গেলে কর আদায়ও হয় কম। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকলে আমদানির পরিমাণও কমে আসে। এর ফলে শুল্ক আদায়ও হয় কম। তৃতীয়ত, সংকটকালে অন্যান্য আয়ের খাত, যেমন রেলের টিকিট বিক্রি, খনিজ সম্পদ বিক্রি ইত্যাদি থেকেও রাজস্ব আদায় কমে আসে। তাই সব মিলিয়ে মন্দার সময় সরকারের আয় হয় কম।

এদিকে সমস্যা হচ্ছে মন্দার সময় আয় কমে গেলে ব্যয় কমানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এর ফলে বাজেট ঘাটতি বাড়তে থাকে। ধরুন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা শুরু হওয়ার আগে প্রাক্কলন করা হয়েছিল যে মোট রাজস্ব আদায় হবে দুই লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু বাজেট পাস হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিল। তখন কি আগের সমান রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে? না, বরং সেই বছর বাজেট ঘাটতি বেড়ে যাবে। বাজেট ঘাটতি বাড়বে দেখে সরকার যদি ব্যয় সংকোচন করে, অর্থনীতির অবস্থা আরও খারাপ হবে। বিষয়টি কীভাবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করা যাক। মনে

করেন, সরকার একটি সেতু নির্মাণ করবে। এই সেতু নির্মাণ করার স্বার্থে অনেক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রথমত, সেতু নির্মাণকাজে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে, প্রকৌশলী নিয়োগ করতে হবে, কাঁচামালের দোকান থেকে বাড়তি কেনাকাটা করতে হবে এবং পরিবহন খাতে বাড়তি কর্মসংস্থান হবে। সর্বোপরি সেতু নির্মাণের দ্বারা দুটি অঞ্চলের মাঝে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হবে। যদি মন্দার সময় সরকার ভয় পেয়ে নির্মাণ ব্যয় বন্ধ করে দেয়, তাতে অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি হবে। তাই অর্থনৈতিক দুরবস্থা মোকাবিলা করতে সরকার বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে আগের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। এর ফলে অবকাঠামোগত ব্যয় হয় বেশি, সেবার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং সবার হাতে হাতে টাকা প্রবেশ করে। মানুষের হাতে বেশি বেশি টাকা প্রবেশ করলে সবাই বেশি বেশি খরচও করে। এভাবে ব্যবসা চাঙা থাকে এবং ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় যে কাজটি সরকার করতে পারে তা হচ্ছে ট্যাক্স কর্তন। ট্যাক্স কম নিলে মানুষের হাতে টাকা থাকে বেশি এবং ভোগব্যয়ও হয় বেশি। এদিকে ভোগব্যয় বেশি হলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোও চাঙা থাকে। সব মিলিয়ে সরকারের ট্যাক্স কর্তন দ্বারা অর্থনীতিতে বাড়তি কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ সাধিত হয়।

আপনাদের মনে আশা জাগতে পারে, এক্সপানশনারি ফিসকাল পলিসি বা যে পলিসি দিয়ে বেশি বেশি টাকা মানুষের হাতে যায়, সেটার দ্বারা উন্নতির চাকা ক্রমাগত ঘোরানো যাবে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, এক্সপানশনারি ফিসকাল পলিসি দ্বারা আসলে ঋণের টিলা-পাহাড় নয়, একেবারে পর্বতমালা তৈরি হয় এবং কিছুদিন পরই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কেটে গেলে বাড়তি কর ও শুল্ক আদায় করতে হয়। অতিরিক্ত কর ও শুল্ক আদায়ের জেরে উন্নয়নের সেই পর্বত কেটে খাল বানিয়ে ফেলার জোগাড় হয় এবং আগের সেই সচ্ছলতার কৃত্রিম অর্জন খালা কাটা কুমিরের কামড়ে একেবারে উবে যায়। সব মিলিয়ে মনেটারি পলিসির মতো ফিসকাল পলিসিও একটি জিরো সাম গেম। দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোর কোনো প্রভাব নেই।

মনেটারি ও ফিসকাল পলিসির ব্যবচ্ছেদ

যদি দীর্ঘ মেয়াদে সব ফলহীন হয়, কেন আমরা মনেটারি বা ফিসকাল পলিসি করি? এই প্রশ্নটির উত্তর জানতে মনে করেন, আপনি সাইকেল চালাচ্ছেন। সাইকেলে যদি সাসপেনশন না থাকে, এবড়োখেবড়ো রাস্তায় আপনি অনেক ঝাঁকি খাবেন। কিন্তু যদি সাইকেলে সাসপেনশন থাকে, আপনি ঝাঁকি না খেয়ে ধীরেসুস্থে ওঠানামা করবেন। অর্থনীতির ব্যাপারটি এমন। একবার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, তারপরে উন্নয়ন, আবার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আবার উন্নয়ন–এমন উত্থান-পতনের যাত্রা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এই উত্থান-পতনের যাত্রাকে ধীরেসুস্থে ওঠানামার মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ফিসকাল এবং মনেটারি পলিসি নেওয়া হয়। এককথায় এই পলিসিগুলো দ্বারা গন্তব্য পরিবর্তিত হয় না। যাত্রা কিছু আরামদায়ক হয়। মূলত সেই লক্ষ্যেই এগুলো করা।

১৯৩০ সালে মহামন্দার আগে মন্দা মোকাবিলায় বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো না। কারণ, এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে নিষ্ফল। কিন্তু ১৯৩০ সালের মন্দা অর্থনীতির জগতে পরিবর্তন আনতে থাকে। জন মেয়ার্ড কেইন্স এই ব্যাপারে একটি বিখ্যাত উক্তি করেছেন, 'In long term we are all dead', অর্থাৎ 'দীর্ঘ মেয়াদে আমরা সবাই মৃত।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এত দীর্ঘকালের চিন্তা করে কী হবে, বর্তমানে যদি ভালো না থাকি? বলা যায়, কেইন্সের হাত ধরেই মহামন্দার পর অর্থনীতির ওপর সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা সামনে আসতে থাকে এবং Macroeconomics বা ব্যাষ্টিক অর্থনীতি নামে নতুন একটি বিষয় গড়ে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করে।

তবে মনেটারি ও ফিসকাল পলিসি সব মিলিয়ে সুফল বয়ে আনছে নাকি কুফল, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। অর্থনীতিবিদেরা যেভাবে যুক্তি প্রদর্শন

করেন (সাসপেনশনের মতো), বাস্তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। উন্নত দেশগুলোর সরকার দিন দিন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অনেক দেশে সরকারি ঋণের বোঝা মোট জিডিপির ১০০%-এর অধিক। এই ঋণের বোঝা কমারও কোনো লক্ষণ নেই। মন্দার সময় ঋণ যেই ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, পরবর্তীতে তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে শূন্য থেকে উন্নয়ন করা কখনো সম্ভব নয়। এমনটা সম্ভব হলে পৃথিবীর সব দেশ এই কাজই করে যেত। সবাই কেবল টাকা ছাপাত এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করত। কিন্তু এই পলিসি দ্বারা ভেনেজুয়েলা বা জিম্বাবুয়ে–কেউই উন্নতি সাধন করতে পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারি বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগ আরও কার্যকরী এবং সরকারের হস্তক্ষেপ অর্থনীতির জন্য আরও ক্ষতিকর।

অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্ব

সাধারণত বিপৎকালীন অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে সহায়তা করে। সরকার যখন অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্বের পথ ধরে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়পত্র কিনে সরকারি সুদের হার দাবিয়ে রাখে। বর্তমানে ইয়োরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ইসিবি) গ্রিস, ইতালি ও স্পেনকে সাহায্য করেছে। জাপানের বেলায়ও কথাটা সত্য। এই লিস্টে আমেরিকা, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডও আছে। বলা যায়, প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে টাকা ছাপিয়ে সাহায্য করতে আসে। তাহলে সরকার কি কখনো নিজ দেশের টাকায় দেউলিয়া হতে পারে?

উত্তর হচ্ছে, পারে। মনে করেন, ঋণ নেওয়ার পর সরকারের আয় আশানুরূপ হলো না। কিছু টাকা গচ্চা গেল। তখন সে কী করবে? হয় সে ব্যয় সংকোচন করবে, অথবা আয় বৃদ্ধি করবে, অথবা পুনরায় ঋণ নেবে। যেহেতু ব্যয় সংকোচন কিংবা কর বৃদ্ধি করা অর্থনীতির জন্য বেশ ক্ষতিকর, সব দেশের সরকার ঋণ নিতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু ঋণ নিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলে সরকার আগের তুলনায় বেশি দায়গ্রস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলাফলস্বরূপ সুদের হার বেড়ে যাবে। তখন সরকারের জন্য ঋণ নবায়ন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। এভাবে সরকার একসময় দেউলিয়া হয়ে যাবে।

ব্যাংক অব কানাডা এই ব্যাপারে একটি ডেটাবেস ও রিপোর্ট তৈরি করেছে (নিচে রিপোর্ট লিংক দেওয়া হলো)[১৪]। এখানে সবচেয়ে ওপরের হালকা ছাই রং হচ্ছে নিজস্ব মুদ্রায় দেউলিয়া হওয়া রাষ্ট্রের সংখ্যা এবং নিচের ছাই রঙের অংশটি হচ্ছে বিদেশি ব্যাংকের ঋণে দেউলিয়া হওয়া রাষ্ট্রের সংখ্যা। মাঝের গাঢ় ছাই রঙের অংশটি হচ্ছে বিদেশি মুদ্রার বন্ডে দেউলিয়া

14 https://www.bank of canada.ca/wp-content/uploads/2020/06/BoC-BoE-Sovereign-Default-Database-Local-Currency-Default-Frequency.pdf

রাষ্ট্রের সংখ্যা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেউলিয়াত্বের জন্য দায়ী মূলত বিদেশি মুদ্রার ঋণ। তারপরে রয়েছে দেশীয় ঋণ ও বিদেশি মুদ্রার বন্ড।

চিত্র : ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের সংখ্যা। (সূত্র : ব্যাংক অব কানাডা ও ব্যাংক অব ইংল্যান্ড)

রাষ্ট্র দেউলিয়া হলে অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়ে?

১। সরকার একাধারে জনগণ, ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিদেশি সংস্থাগুলোর কাছে ঋণী থাকে। তাই সরকার যখন দেউলিয়া হয়, বিপুল অঙ্কের টাকা Bad Debt (খেলাপি ঋণ) হয়ে যায়। এত টাকার ঋণ খেলাপি হয়ে গেলে সবগুলো ব্যাংকের অবস্থা একসাথে খারাপ হয়ে যায়, যা ফাইন্যান্সিয়াল বিশ্বের জন্য অশনিসংকেত।

২। সরকার যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, ব্যাংকগুলোর পুঁজি সংকুচিত হয়ে আসে। একটি ব্যাংক কী পরিমাণ ঋণ ইস্যু করতে পারবে, তার বিপরীতে পুঁজির একটি ন্যূনতম সীমা থাকে। সমস্যা হচ্ছে সরকার যেহেতু অনেকগুলো ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে থাকে, সে দেউলিয়া হয়ে গেলে অনেকগুলো ব্যাংকের পুঁজি সংকুচিত হয়ে আসে। এতে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ ইস্যু করতে পারে না। এভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে আসে।

৩। অর্থনৈতিক সংকটকালে ব্যাংকগুলো ঋণ ইস্যু করতে না পারলে অর্থনীতিতে নতুন টাকা তৈরি হয় না। তাই পুরাতন ঋণের দায় সুদে-আসলে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেউলিয়াত্ব ছড়িয়ে পড়ে।

৪। সরকার দেউলিয়া হলে জনগণের ভোগব্যয়ও কমে আসে। দেউলিয়া দেশের জনগণের হাতে থাকা সঞ্চয়পত্রগুলোর মূল্যমান কমে আসে। এর ফলে মানুষের হাতে হাতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও কমে আসে।

৫। সঞ্চয়ের মূল্যমান কমে গেলে আপনি আগের সমান ব্যয় করতে পারেন না। ধরুন, একটি ব্যাংকে আপনার ১ কোটি টাকা সঞ্চয় আছে। হঠাৎ করে আপনি জানতে পারলেন, ব্যাংকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। আবার মনে করুন, আপনি ১ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র কেনার কিছুদিনের মাথায় সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে আপনার ব্যয়ের ধাঁচেও পরিবর্তন আসবে। এভাবে সমাজের অনেকে ব্যয় কমিয়ে দিলে সমগ্র অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে পড়বে।

৬। সরকার দেউলিয়া হওয়ার সাথে সাথে ফাইন্যান্সিয়াল বিশ্বে শক ওয়েভ শুরু হয়ে যায়। দেউলিয়া দেশের মুদ্রামান পড়ে যায় এবং ব্যাংকিং খাত দুর্বল হয়ে যায়। পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেলে অনেকেই ব্যাংকের থেকে টাকা তুলতে দৌড় দেয়। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে ব্যাংকে যে পরিমাণ ডিপজিট থাকে, তার সমপরিমাণ টাকা সিন্দুকে জমা থাকে না। তাই সবাই যখন একসাথে টাকা তুলতে দৌড় দেয়, ব্যাংক তখন দরজা বন্ধ করে দেয়। অর্থনীতির সংকটকালে ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার এ-জাতীয় ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে ব্যাংক হলিডে। অনেক সময় ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কেবল সামান্য পরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি দেয়। এর ফলে মুদ্রাসংকট ও মন্দা তীব্র আকার ধারণ করে।

৭। সরকার দেউলিয়া হওয়া মানে সামনের বছরগুলোতে বাজেটে খুব কম টাকা ব্যয় হওয়া। সরকার কম অর্থ ব্যয় করলে দেশের উন্নয়ন হয় কম। এজন্য সরকার দেউলিয়া হলে একই সাথে ব্যবসা বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীদের কর্তৃক ঋণ নেওয়ার পরিমাণ কমে যায়। যেহেতু ঋণ নেওয়া কমে গেলে নতুন টাকা তৈরি হওয়া কমে আসে। সরকার দেউলিয়া হলে একটি দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও দেউলিয়া হওয়া শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে।

৮। সবশেষে সরকারি দেউলিয়াত্ব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের মতো নয়। একজন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে যেমন তার সম্পদ জব্দ করে ঋণের ক্ষতি উশুল করা হয়, তেমনি করে সকল সরকারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ঋণ উশুল করার ব্যবস্থা নেই। তাই দেখা

যায় সরকার দেউলিয়া হলে ঋণদাতা এবং সরকার মিলে সমঝোতা করে। ঋণদাতারা চায় যথাসম্ভব বেশি টাকা আদায় করতে এবং সরকার চায় যথাসম্ভব কম টাকা দিয়ে বাঁচতে। সরকার অনেক সময় টাকা ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধ করা শুরু করে, যা হাইপার ইনফ্লেশন তৈরি করে। এজন্য কোনো দেশের সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলে সেই দেশের টাকার মান পড়ে যায় এবং নতুন ঋণদাতারা ভয়েও সেই দেশের কাছে আসতে চায় না।[১৫]

১৫ ঋণ যদি বিদেশি মুদ্রায় হয়ে থাকে, টাকা ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে গেলে চরম মূল্য দিতে হয় (একমাত্র আমেরিকাকে এই ঝামেলা পোহাতে হয় না)। বহু দেশ এভাবে ঋণের চক্রে পড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

অভ্যন্তরীণ দেউলিয়াত্বের সমাধান

অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্ব মোকাবিলা করার জন্য সরকারের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ হতে পারে ঋণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা বাদ দিয়ে নিজস্ব মুদ্রা ছাপানো। আপনি ভাবছেন 'টাকা' নিজেই তো আমাদের মুদ্রা, আবার নতুন কী ছাপাবে? আসলে নতুন নয়, টাকাই ছাপাক, সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় প্রিন্ট করে সুদে ঋণ না নিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিজেই ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্টে ও খাতে খরচ করবে।

প্রথমত, সরকার খেয়ালখুশিমতো মুদ্রা ছাপালে দেশের অর্থনীতি ধসে পড়বে। তাই বলে এই ছাপানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকলেই যে সিস্টেম নিরাপদ, সেটা কিন্তু সত্য নয়। অসৎ শাসক যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অসৎ সুবিধা নিতে পারে অসৎ গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে, তেমনি নিজের কাছে থাকা মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতার অপব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি করাতে পারে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে যেমন বুঝেশুনে টাকা ছাপাতে পারে ও বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়াতে বা কমাতে পারে, তেমনি যেকোনো দেশের যেকোনো সৎ শাসক এই পুরো কাজটা নিজের অর্থ মন্ত্রণালয় দিয়েই করতে পারে। এমন তো নয় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা এসব জ্ঞান-বাইরের জগতের মানুষ। বরং, যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে, তারা ঠিক একই কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়ে বসে করতে সক্ষম। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচার জন্য এবং দেশের স্বাবলম্বিতার জন্য সুদভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে পরিচ্ছন্ন ও হালাল অবস্থায় আনতে চায় কি না।

দ্বিতীয় যে কাজটি সরকার করতে পারে তা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম বন্ধ করা। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম চালু থাকলে ব্যাংকগুলো অদৃশ্য টাকা তৈরি করে যেতে থাকবে। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ হচ্ছে এমন একটি

ব্যবস্থা, যেখানে ক্রেডিট (ঋণ) দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো টাকা তৈরি করতে পারে এবং সেই টাকার ওপরে সুদ ভোগ করতে পারে। সাধারণত টাকা ছাপানোর একটি সীমা থাকে। একটি ব্যাংকের হাতে থাকা রিজার্ভের কত গুণ টাকা সে ছাপাতে পারবে, তা দেশে দেশে এবং যুগে যুগে তারতম্য করে। তবে এই সীমা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ, বর্তমানে আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করি। ব্যাংকে কার কত টাকা আছে, তা আমরা ডিজিট চেক করেই বলে দিতে পারি। লেনদেন করতে আমরা একজনের এক ব্যাংকের থেকে আরেকজনের আরেক ব্যাংকে মানি ট্রান্সফার করে দিই। আবার ছোট পর্যায়ে লেনদেন করতে আমরা ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করি। আমি যখন নরওয়েতে ছিলাম, তখন টাকা কী জিনিস, তা চোখেও দেখতাম না। সবাই সেখানে লেনদেন করত ডিজিটালি। যার যার সাথে তার তার ব্যাংক কার্ড থাকত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন প্রদান করতাম ডিজিটালি। শিক্ষক ও কর্মচারীরা বেতন পেত ডিজিটালি, দোকান থেকে সবাই পণ্য কিনত ডিজিটালি এবং শ্রমিকেরাও বেতন পেত ডিজিটালি। তাহলে ব্যাংকের থেকে টাকা তোলার প্রয়োজনীয়তা কী? এককথায় কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সব মিলিয়ে নরওয়েতে ব্যাংকের থেকে টাকা তোলা ছিল একটি উদ্ভট ব্যাপার। তাহলে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তা কী? ঋণ বিফল হয়ে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি কমানো ছাড়া কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমি কোনো অলীক গল্প করছি না। বাস্তবে তা-ই হচ্ছে। ফুটনোটে দেওয়া লিংকে লক্ষ্য করুন, কিছু কিছু দেশের রিকোয়ার্ড রিজার্ভ (যে পরিমাণ অদৃশ্য টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ বস্তুগত টাকা রাখতে হবে) মাত্র ৫ শতাংশ, ২ শতাংশ, ১ শতাংশ এমনকি ০ শতাংশ পর্যন্ত আছে (অর্থাৎ ব্যাংক যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপিয়ে সুদে ঋণ দিতে পারবে)।[১৬] কিন্তু প্রথম যখন ইংল্যান্ডে এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রদান করা হয়, তখন এর অনুপাত ছিল ৫০ শতাংশ (হাতে থাকা টাকার দ্বিগুণ ঋণ দিতে পারবে)।

অর্থাৎ মুদ্রাব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা দিন দিন কমে আসছে। এখন কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোই মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। একটি জাতির মুদ্রাব্যবস্থা কিছু স্বার্থপর, লোভী ও অনির্বাচিত ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করলে কী হয়, তা ব্যাখ্যা করা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এগুলো বিস্তারিত বর্ণনাপূর্বক জানতে 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি পড়ার বিশেষ আমন্ত্রণ রইল। সব মিলিয়ে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম চালু থাকলে সরকারি মুদ্রা,

---

16 http://www.centralbanknews.info/p/reserve-ratios.html

সোনার মোহর বা রুপার মুদ্রা, যেটাই আসুক না কেন, অর্থনীতিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসবে না। ব্যাংকগুলোই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে লাউ সেই কদু হবে। তাই ন্যায্য অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের অবশ্যই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমকে বাদ দিতে হবে। তাহলেই আমরা অভ্যন্তরীণ দেউলিয়াত্ব-প্রবণতামুক্ত একটি মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

Nothing can more affect national prosperity than a constant and systematic attention to extinguish the present debt and to avoid as much as possibly the incurring of any new debt.

–Alexander Hamilton

বর্তমান ঋণের দায় পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে দূর করা এবং ভবিষ্যতে নতুন ঋণ নেওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নকে যত বেশি প্রভাবিত করতে পারে, আর কোনো কিছুই তা পারে না।

–আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, যিনি ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ঋণ

এই পর্যন্ত আমরা কেবল অভ্যন্তরীণ ঋণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে সরকার মূলত আন্তর্জাতিক ঋণে দেউলিয়া হয়। এই বই লেখা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়া হওয়ার নিদর্শন তুলনমূলক বিরল।[১৭] আমরা আরও দেখেছি যে অভ্যন্তরীণ ঋণে সরকারের অবস্থা খুব খারাপ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে সহায়তা করে। বর্তমানে আমেরিকা, ইতালি, জাপান, সুইজারল্যান্ডসহ অনেক উন্নত রাষ্ট্রই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাইফ সাপোর্টে আছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা বিনা মূল্যে আসে না; এই সহায়তা ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। আমরা আরও জেনেছি মনেটারি ও ফিসকাল পলিসি জিডিপিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনে না; কেবল ঋণ ও দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সবশেষে আমরা অভ্যন্তরীণ দেউলিয়াত্ব থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝে থাকলে চলুন আন্তর্জাতিক লেনদেনের দিকে চোখ ফেরাই।

একটি দেশের সরকার বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক ঋণ নিয়ে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হচ্ছে বাণিজ্যে ডলারের চাহিদা। বর্তমানে প্রায় সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ডলারে সংগঠিত হয়ে থাকে। ডলার ছাড়া একটি দেশ চলতে পারে না; যেভাবে টাকা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। তাই কোনো রাষ্ট্রের হাতে ডলার না থাকলে টিকে থাকার স্বার্থেই তাকে

---

১৭ ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্ব বাড়তে পারে, যেহেতু অনেক দেশের সরকার একেবারে খাদের কিনারায় আছে। তা ছাড়া জনগণের ওপর ব্যাংকারদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

ডলারে ঋণ নিতে হয় এবং এই ঋণ শোধ করতে না পারলে রাষ্ট্রকে দেউলিয়া হতে হয়।[১৮]

এই বিষয়গুলো বোঝা এতটাই জরুরি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থনীতির রহস্যময় জগৎকে পাঠকদের সামনে উন্মোচিত করতে আমার বর্তমান বইটি লেখা। আমরা এই পর্যন্ত মুদ্রাব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার ডলারকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও দেউলিয়াত্বের কূটকৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব।

---

১৮ বিদেশি ঋণ পরিশোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে সহায়তা করতে পারে না। তাই বিদেশি ঋণে দেউলিয়া হওয়ার ঘটনা অনেক অনেক বেশি।

এলসি

এলসি শব্দটির অর্থ হচ্ছে লেটার অব ক্রেডিট। ফাইন্যান্সের জগতে ঋণকে বলে ক্রেডিট, যেমন ঋণদাতাকে আমরা বলি ক্রেডিটর, ঋণের কার্ডকে আমরা বলি ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। যেহেতু ইংরেজি লেটার শব্দটির অর্থ হচ্ছে পত্র, এলসি শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়, যে পত্রে ঋণ লেনদেন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কি ব্যাপারটি তাই? মোটেও না। চলুন, এলসি বিষয়টি কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা যাক।

আমরা মূলত বিদেশি পণ্য রপ্তানি বা আমদানি করতে এলসি খুলি। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাইকেল আমদানিকারক যখন চীন থেকে সাইকেল কিনে বাংলাদেশে আনেন, তখন তিনি এলসি খোলেন। আবার একজন চিংড়ি উৎপাদনকারী যখন বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চিংড়ি রপ্তানি করেন, তখন বিদেশি আমদানিকারক এলসি খোলেন। এককথায়, একটি রাষ্ট্রের নাগরিকেরা যত প্রকার আমদানি-রপ্তানি করে, তার প্রায় সবগুলোই এলসির বিপরীতে হয়। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এলসি খোলা আবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার বোনের জন্য সাইকেল কিনবেন, আপনি কি এলসি খুলবেন? না, আপনি সাইকেলের দোকানে গিয়ে বিক্রেতার হাতে এক বান্ডেল টাকা ধরিয়ে অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে বলবেন, 'আমাকে একটি সাইকেল দিন।' বিক্রেতা তখন আপনার হাতে একটি সাইকেল তুলে দেবে। এভাবে একই দেশের ভেতরে লেনদেন করতে আমরা এলসি ছাড়াই কেনাবেচা করি।

এলসি খুলতে হলে প্রথমে আপনাকে ব্যাংকে যেতে হবে। ব্যাংক আপনার জন্য এলসির ফাইলপত্র তৈরি এবং সংরক্ষণ বাবদ একটি চার্জ নেবে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক লেনদেনে সুইফট মেসেজ করার জন্য আলাদা একটি চার্জ নেবে ব্যাংক। সবশেষে ব্যাংক আপনার থেকে এলসির

সার্ভিস ফি নেবে (হাজারে বিশ পয়সা)। এই সার্ভিস ফি হচ্ছে এলসির সেবামূল্য। সেবামূল্য বিষয়টি কীভাবে কাজ করে, তা বোঝা যাক। মনে করেন, আপনি এলসির মাধ্যমে একটি পণ্য রপ্তানি করছেন। কিন্তু আপনি যাকে পণ্য পাঠিয়েছেন, তিনি মাল বুঝে পেলেও আপনাকে টাকা না দিয়ে বসে আছেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি আমদানিকারকের ব্যাংকে (আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে) প্রমাণ পাঠাতে পারেন যে সবকিছু প্রস্তুত করে আপনি ঠিকমতো গন্তব্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বিদেশি ব্যাংক আপনাকে ডলার দিতে বাধ্য। অর্থাৎ এলসি খোলার পর আপনার কাজ হচ্ছে ক্রেতার উদ্দেশ্যে পণ্য হস্তান্তর করা।[১৯] আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করলেই ব্যাংক আপনাকে ডলার পে করবে। এর বেশি কোনো ঝুঁকি আপনাকে বহন করতে হবে না।

এক ধরনের এলসিতে লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার কাগজ দেখার সাথে সাথেই ব্যাংক আপনাকে পে করে দেবে (সাইট এলসি)। আরেক ধরনের এলসি সম্পন্ন হওয়ার কিছুদিন পরে (যেমন ১২০ দিন পরে) ব্যাংক আপনাকে পে করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি পেঁয়াজ আমদানি করে দেশীয় বাজারে বিক্রি করেন। এক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই পেঁয়াজ হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই টাকা দিতে পারবেন না। আপনাকে আগে দেশীয় বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হবে। তারপর আপনি এই টাকা ব্যাংকে পে করবেন। ব্যাংক ডলার কিনে ভারতে পাঠিয়ে দেবে। এভাবে রপ্তানিকারক হাতে টাকা পাবেন। কিন্তু যদি কারও দ্রুত টাকার প্রয়োজন পড়ে, সে ১২০ দিন বসে না থেকে কিছু সুদের বিনিময়ে (ডিসকাউন্টে) ক্যাশ আউট করে ফেলে। অর্থাৎ এক মাস পর ১০০ ডলার পাওয়ার কথা থাকলেও একজন বিক্রেতা ২% ডিসকাউন্টে বাকি থাকা ডলার ক্যাশ আউট করে ফেলে। এক্ষেত্রে ১০০ ডলারের মধ্যে ৯৮ ডলার যায় বিক্রেতার পকেটে এবং ২ ডলার যায় ব্যাংকের পকেটে সুদ হিসেবে। সব মিলিয়ে এলসি লেনদেনে সরাসরি কোনো সুদ যুক্ত থাকে না। তবে কেউ যদি দ্রুত টাকা হাতে পেতে চায়, সে সুদের বিনিময়ে ক্যাশ আউট করতে পারে।

---

১৯ ঠিক কোন পর্যায়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর হয়, তা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে বিক্রেতা ট্রাকে পণ্য তুলে দিলেই মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে মাল প্যাকেট করলে মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে মাল পৌছালে মালিকানা হস্তান্তর হয়।

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বিক্রেতার অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডলার পাঠিয়ে না দিয়ে এলসি খোলার প্রয়োজনীয়তা কী? এলসি খোলার একটি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে বাকিতে ব্যবসা করা, যা বর্তমানে সর্বব্যাপী একটি চর্চা। এলসি খোলার আরেকটি কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা। মনে করেন, ভারত থেকে একজন আপনাকে পচা পেঁয়াজ পাঠাতে চাইল। এই ব্যাপারে এলসি চুক্তি আপনাকে সুরক্ষা দেবে। ভারত থেকে সে পুনরায় ভালো পেঁয়াজ পাঠাবে, নয়তো কোনো টাকা পাবে না। আবার মনে করেন, ভারতের ব্যক্তি ঠিকই পেঁয়াজ পাঠিয়েছে, কিন্তু আপনি টাকা না দিয়ে বসে আছেন। এই ঝুঁকি বহন করবে কে? ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খুললে ব্যাংক এই ঝুঁকিগুলো ব্যাংক বহন করে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন নিরাপদ হয়।

টীকা : ব্যাংকের ক্ষমতায়ন

একজন ব্যবসায়ী যদি তার খুব বিশ্বস্ত পার্টনারের সাথে এলসি ছাড়া টাকা লেনদেন করতে চায়, সে তা করতে পারে। যেমন বংশালের একজন সাইকেল বিক্রেতা চীন থেকে সাইকেল কিনতে হাতে থাকা ডলার ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে পাঠিয়ে দেয়। এভাবেও লেনদেন সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এগুলো আইনেই বৈধতা পায় না। তাই সবাইকে ব্যাংকের শরণাপন্ন হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের আইন এমনভাবে সাজানো যে ব্যাংক ছাড়া কোনো গতি নেই। এই কথাটির মানে এই নয় যে ব্যাংক ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো গতি নেই। চলমান আইনকানুন পরিবর্তন করলেই গতি হয়ে যাবে।

ব্যাংক এখানে Escrow Account হিসেবে কাজ করে। Escrow Account কী? Escrow Account হলো এমন একটি অ্যাকাউন্ট, যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ একটি লেনদেন সম্পন্ন করার সময় টাকা তৃতীয় পক্ষের ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে। ব্যবসায়ী Escrow Account-এর চুক্তি অনুযায়ী মাল ডেলিভারি করা কিংবা গ্রহণ করার পর এই অ্যাকাউন্টের টাকা ছাড় করাতে পারবে। যদি কোনো পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে টাকাটা পাওনাদারকে ফেরত দেওয়া হয়।

বুঝতেই পারছেন, যেকোনো প্রতিষ্ঠান চাইলেই Escrow Account-এর কাজ করতে পারে। কিন্তু আইন করে শুধু ব্যাংক যেন এই কাজ করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই জন্য আমাদের কাছে মনে হয় ব্যাংক ছাড়া কোনো গতি নেই।

একই দেশের ভেতরে ব্যবসায়ীরা নিজেদের মাঝে লেনদেন করতে পুরাতন উপায়ে টাকা লেনদেন ও বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসা পার্টনারের বিশ্বস্ততা ও কথার সাথে কাজের মিল গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি

পার্টনারদের সাথেও এভাবে ব্যবসা করা সম্ভব। কিন্তু ডলারভিত্তিক লেনদেন করলে যদি তা ৫,০০০ ডলারের বেশি হয়, আমদানিকারককে অবশ্যই এলসি খুলতে হয়। অর্থাৎ এলসি খোলা কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, এইটা একটা আইন। তাই বৈধ আমদানি করতে গেলে এলসি খুলতে হবে। ধরি, আপনি বাংলাদেশে সাইকেল আমদানি করবেন। আপনি একটি এলসি খুললেন। এই এলসির বিপরীতে চীনের সাইকেল প্রস্তুতকারক বাংলাদেশে থেকে পাওয়া অর্ডার অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত করে মাল হস্তান্তর করে। মাল বুঝে পেয়ে আমদানিকারক ব্যাংককে জানান যে তিনি মাল বুঝে পেয়েছেন। একই সময় চীনের সাইকেল প্রস্তুতকারক চীনের ব্যাংকে গিয়ে কাগজপত্র জমা দেন যে তিনি মাল হস্তান্তর করে দিয়েছেন। প্রস্তুতকারকের সেই কাগজ দেখে চীনের ব্যাংক ১২০ দিনের মধ্যে তার পাওনা ডলার হাতে দিয়ে দেয়। এদিকে সাইকেল ক্রেতা বাংলাদেশি ব্যাংককে ডলার/টাকা দেয়। এভাবে দুই দেশের দুই ব্যাংক গ্যারান্টর হয়ে লেনদেনটি সম্পন্ন করে।

ব্যাক টু ব্যাক এলসি

চলুন, আমরা উদীয়মান শিল্পপতি মোস্তফা মামুনের সাথে অভিজ্ঞ ব্যাংকার অলীক আহমেদের একটা কাল্পনিক কথোপকথন শুনে আসি।

মোস্তফা মামুন : আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন?

অলীক আহমেদ : ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি আলহামদুলিল্লাহ, বসুন, প্লিজ। চা দিই?

মোস্তফা মামুন : জি, প্লিজ। কোনো সমস্যা নেই।

অলীক আহমেদ : এই নাসির, কোথায় গেলা? দুই কাপ চা দাও এখানে। জি ভাই, বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।

মোস্তফা মামুন : আমার একটা গার্মেন্টস আছে, মামুন সোয়েটার কারখানা, গাজীপুরের মাওনায়। আমি তুর্কমেনিস্তানে সোয়েটার রপ্তানি করতে চাই। এজন্য চীন থেকে সুতা এবং জার্মানি থেকে রং আমদানি করতে হবে। আমাকে এই দুই দেশের থেকে আমদানি এলসি খুলে দিন।

অলীক আহমেদ : আপনার অ্যাকাউন্টে কি টাকা বা ডলার আছে?

মোস্তফা মামুন : না, ডলার নেই, টাকাও নেই।

অলীক আহমেদ : তাহলে আপনি কীভাবে এলসি খুলবেন? আমাকে ডলার দিলে আপনার জন্য আমদানি করে দিতাম। আমাকে টাকা দিলে আমি ডলার কিনতাম। এখন খালি হাতে লেনদেন সম্পন্ন করব কীভাবে?

মোস্তফা মামুন : এই যে দেখেন, আমি রপ্তানি অর্ডার পেয়েছি। পোশাক রপ্তানি করে ডলার অর্জন করে আমি আপনাকে দেব। আপনি এখন আমদানি করার জন্য আমাকে এলসি খুলে দিন।

অলীক আহমেদ : ঠিক আছে। আমি আপনাকে আমদানি করার এলসি খুলে দিচ্ছি। মোট যত ডলারের রপ্তানি অর্ডার আপনি পেয়েছেন, তার ৭০ শতাংশের আমদানি এলসি খুলে দিচ্ছি। নাসির চা নিয়ে এসেছে, প্লিজ, চা নিন। আমি কাগজপত্র রেডি করছি।

মোস্তফা মামুন : ধন্যবাদ। চা'টা মজা হয়েছে।

ওপরে যে ঘটনাটা ঘটল, অর্থাৎ টাকা/ডলার ছাড়াই ব্যাংক এলসি খুলতে লেগে গেল, এই ব্যাপারটার নাম 'ব্যাক টু ব্যাক এলসি'। এখানে একটি রপ্তানি এলসির বিপরীতে আমদানি এলসি খোলা হয়েছে। এই উপায়ে একজন শিল্পপতি কোনো টাকা বা ডলার ছাড়াই ব্যাক টু ব্যাক এলসির সহায়তায় ব্যবসা শুরু করতে পেরেছে। এটি আক্ষরিক অর্থেই কোনো ঋণ নয়। কিন্তু তারপরও এটি একপ্রকার ঋণের মতো কাজ করে, যেহেতু কোনো টাকা ছাড়াই এই পদ্ধতিতে একজন ব্যবসা শুরু করতে পারে।

এলসির সাথে আমেরিকার আধিপত্যের সম্পর্ক

খোলাবাজারে আমরা যেভাবে ডলার কিনি, বড় বড় লেনদেনগুলো সেভাবে সম্পন্ন হয় না। আমদানি-রপ্তানি করতে ব্যাংকগুলোকে ডলার সঞ্চয় করে রাখতে হয়। সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো এই সঞ্চিত ডলার আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে ডিপজিট করে রাখে। আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে ডিপজিট করে রাখা ডলারের অ্যাকাউন্টকে বলে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করেন, আপনি একজন আমদানিকারক। চীন থেকে তুলা আমদানি করতে আপনি সুরমা ব্যাংকে এলসি খুলবেন। আপনার অর্ডার মোট ১০০ কোটি টাকার হলে সুরমা ব্যাংক গ্যারান্টর হয়ে চীনের জুং গুয়া ব্যাংকের সাথে আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন করবে।

দেখা গেল, তুলা কেনার এক দিন পর আপনি গায়েব হয়ে গেলেন, অথবা আপনার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেল। এক্ষেত্রেও চীন থেকে পণ্য সরবরাহ করার ১২০ দিনের মধ্যে চীনা ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারীকে ডলার দিয়ে দেবে। নিয়ম হচ্ছে, সুরমা ব্যাংক জুং গুয়া ব্যাংককে ডলার দেবে এবং জুং গুয়া ব্যাংক ডলার দেবে তুলার সরবরাহকারীকে। তাই আপনি দেউলিয়া হলে বা পালিয়ে গেলে সুরমা ব্যাংক লোকসান গুনবে। এজন্যই এলসি খোলার আগে ব্যাংক আপনার অবস্থা যাচাই-বাছাই করে নেয়। আপনি যদি সন্দেহজনক প্রমাণিত হন, ব্যাংক আপনার জন্য এলসি খুলবে না। এবার চিন্তা করে দেখুন, আপনার মতো আপনার ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে চীনের জুং গুয়া ব্যাংককে লোকসান গুনতে হবে। তাই এলসি খোলার সময় জুং গুয়া ব্যাংক সুরমা ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট দেখবে। সুরমা ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ডলার থাকে এবং লেনদেনের ইতিহাস ভালো থাকে, তাহলে লেনদেন করতে জুং গুয়া

ব্যাংক আগ্রহী হবে। এভাবে পৃথিবীর সকল ব্যাংক আন্তর্জাতিক লেনদেনে একে অপরের খোঁজখবর নিয়ে এলসি খুলে। এবার চিন্তা করে দেখুন, এলসি ব্যবস্থা কীভাবে আমেরিকার ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী করছে। আমদানি-রপ্তানি করতে সবাইকে আমেরিকাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ডলার রাখতে হয়। বিশ্বের সব দেশের ব্যাংক এমনটা করতে বাধ্য। তাই আমেরিকার ভায়া হয়েই সারা বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। অপর কথায় আমরা বলতে পারি, আমেরিকান ব্যাংকগুলো বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক লেনদেন পরিচালনা করছে এবং দেশ হিসেবে আমেরিকা গ্লোবাল ফাইন্যান্সের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

অভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রা

এলসি যে কেবল ডলারে সম্পন্ন হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোনো মুদ্রাতেই এলসি চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের সিংহভাগই বর্তমানে ডলারে হয়ে থাকে। কেন এমন হয়ে থাকে, তার পেছনে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণ জড়িত। আমরা এখন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করব।

মনে করি, সোহেল ও রোকন দুজনই বাংলাদেশে থাকে। সোহেল যখন কেনাকাটা করবে, যেমন তার বোনের জন্য শাড়ি কিনবে, তখন সে টাকাতে পেমেন্ট করবে। কারণ, বাংলাদেশের সকল প্রান্তে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিনিময় মাধ্যম হচ্ছে টাকা। কিন্তু সোহেল যখন ইংল্যান্ড থেকে একটি রোলস রয়েস গাড়ি কিনতে চাইবে, তখন কী হবে? রোলস রয়েস কোম্পানিকে সোহেল মোট ৪ কোটি 'বাংলাদেশি টাকা'র ব্রিফকেস ধরিয়ে দিলে রোলস রয়েস কোম্পানি মহা ফ্যাসাদে পড়বে। কোম্পানি গাড়ি বেচতে চাইবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এর বিনিময়ে পাওয়া 'বাংলাদেশি টাকা' দিয়ে শ্রমিকদের বেতন বা ট্যাক্স কিছুই দিতে পারবে না। কারণ, ইংল্যান্ডের দোকানপাট-বাজারঘাট বাংলাদেশি টাকায় চলে না, সেখানে চলে পাউন্ড। কিন্তু সমস্যা হলো, বাংলাদেশ পাউন্ড তৈরি করে না। তাহলে সোহেল পাউন্ড পাবে কোথা থেকে? সোহেল যদি বাংলাদেশের কারও থেকে টাকার বিপরীতে পাউন্ড কিনতে চায়, বঙ্গবাজার বা ঠাটারী বাজারে এমন একজন গ্রাহকও খুঁজে পাবে না। কারণ, তার দরকার এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, যিনি পাউন্ড বিক্রি করে টাকা নিতে চান। তাই কোনো ব্রিটিশ ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ থেকে পণ্য বা সেবা কিনতে চান অথবা বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে চান, তাহলেই পাউন্ডের বিনিময়ে তিনি টাকা নিতে রাজি হবেন। এমন ব্যক্তিকে খুঁজে না পেলে রোলস রয়েস-প্রেমী সোহেলের সাধ অপূর্ণ থেকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যখন ইয়োরোপে রপ্তানি করা হয়, তখন ওখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদের ধরিয়ে দিতে চান ইয়োরো। কিন্তু এবার উল্টা সমস্যা, ইয়োরো দিয়ে দেশের বাজারে কেনাকাটা করা বা শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করা–কোনোটাই সম্ভব নয়। ইয়োরোপীয় ক্রেতার পক্ষেও তৈরি পোশাক কেনার জন্য বাংলাদেশি টাকা জোগাড় করা সহজে সম্ভব নয়। এসব প্যাঁচে পড়ে আন্তর্জাতিক লেনদেন সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

সমস্যাটি দূর করতে আগেকার দিনে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহার করা হতো সোনা বা রুপা। সেই সময় এই দুটি ধাতু ছিল সবার কাছে গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক লেনদেনের সাধারণ বিনিময়মাধ্যম। তখন কোনো দেশ পণ্য রপ্তানি করলে কোষাগারে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। আবার আমদানি করলে কোষাগারে থেকে স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস পেত। অর্থাৎ স্বর্ণই ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা। এভাবেই চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত।

কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণী হয়ে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের দ্বারা আর টাকার বিপরীতে স্বর্ণ মজুত করে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমে নতুন নিয়ম জারি করা হলো। একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ মজুত থাকবে আর বাদবাকি সব মুদ্রা ডলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। এভাবে মার্কিন ডলার হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ মুদ্রা।

চিত্র : ব্রেটন উডস হোটেল

তখন থেকেই দুটি ভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করত ডলারে। কারণ, তাদের হাতে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ছিল না এবং কেবলমাত্র ডলারের বিপরীতেই স্বর্ণ মজুত ছিল। এককথায় ব্রেটন উডস চুক্তির পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলার হয়ে উঠল নতুন স্বর্ণ। তখন প্রতিটি দেশের জন্য নিয়ম ছিল সোনার দামের সাথে মিল করে টাকা ছাপানো, যেন তাদের মুদ্রা একে অপরের বিপরীতে স্থায়ী এক্সচেঞ্জ রেট বজায় রাখতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকা এই প্রতিশ্রুতি রাখেনি। তারা অতিরিক্ত ডলার ছাপাতে থাকে। এর ফলে স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম হুহু করে পড়তে থাকে। এমনকি ১৯৭১ সালে মার্কিন ডলারের দাম প্রতি আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে নির্ধারিত ৩৫ ডলার থেকে নেমে ২০০-তে চলে আসে।

ডলারের এই পড়তি দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপের দেশগুলোর অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকে। সেসব দেশ তখন তাদের কাছে মজুত থাকা ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ দাবি করে বসে আমেরিকার কাছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জেস পম্পিদিউ ডলার ভাঙিয়ে নিরাপদে সোনা নেওয়ার জন্য আমেরিকাতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠান।

আগস্টের ১১ তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রেজারি অনুরোধ করে, আমেরিকা যেন ব্রিটেনের পাওনা ৩ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ ফোর্ট নক্স থেকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নিয়ে রাখে। সেই সময়ে আমেরিকা নিজের স্বর্ণ রাখত ফোর্ট নক্সে আর অন্য দেশের স্বর্ণ রাখত নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে। আমেরিকা অনুরোধ শুনেই বুঝে ফেলে যে ব্রিটেন, যাদের সাথে বসে তারা ব্রেটন উডস চুক্তি করেছে, তারাই এখন স্বর্ণ উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই ১৫ আগস্ট পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণের মজুত ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এভাবে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের ইতি ঘটে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যের জন্য একটি সাধারণ মুদ্রা প্রয়োজন, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। ব্রেটন উডসের কল্যাণে সেই গ্রহণযোগ্য সাধারণ মুদ্রার রাজ আসন বর্তমানে দখল করে আছে মার্কিন ডলার।

ছবি : রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণমুদ্রাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করছেন, ১৫ আগস্ট ১৯৭১।

ডলার দিয়ে কেন আন্তর্জাতিক লেনদেন হয়, তা আরেকবার খতিয়ে দেখতে আপনাদের একটি প্রশ্ন করি। ভারত থেকে প্রতি মাসে আমরা ৫০ কোটি রুপি মূল্যের পণ্য ও সেবা আমদানি করি। এদিকে ভারত আমাদের থেকে ১০ কোটি রুপি মূল্যের পণ্য ও সেবা আমদানি করে। অর্থাৎ ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি ৪০ কোটি রুপি। এই বাড়তি রুপি জোগাড় হবে কোথা থেকে?

আবার ধরুন, বাংলাদেশ প্রতিবছর ৫০ কোটি ইয়োরো সমমূল্যের পণ্য ও সেবা ইয়োরোপে রপ্তানি করে। আবার ইয়োরোপ থেকে বাংলাদেশ ১০ কোটি ইয়োরো সমমূল্যের পণ্য ও সেবা আমদানি করে। ইয়োরোপের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্তি ৪০ কোটি ইয়োরো। এই বাড়তি ইয়োরো দিয়ে আমরা কী করব?

সবশেষে আরেকটি প্রশ্ন করি। ব্রুনেই থেকে তেল কিনতে আমাদের ডলার লাগে। কিন্তু ব্রুনেইতে আমরা তেমন কিছু রপ্তানি করি না। তেল কিনতে আমরা কীভাবে ডলার জোগাড় করব?

ওপরের সবগুলো সমস্যাকে মোটাদাগে একটা সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা যায়–আন্তর্জাতিক লেনদেনে মুদ্রার বিভিন্নতা। ডলারে আন্তর্জাতিক লেনদেন করলে ইয়োরোপের ক্রেতারা আমাদের ডলারে পে করবে। আমরা যেহেতু ইয়োরোপ থেকে সমান বস্তু কিনি না, এই বাড়তি ডলার দিয়ে বাংলাদেশ ব্রুনেই থেকে তেল কিনবে। আবার ব্রুনেই ডলার পেয়ে তা দিয়ে চীন থেকে ইলেকট্রনিকস কিনবে। ওদিকে চীন বাড়তি ডলার দিয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ করবে। এভাবেই বর্তমান বিশ্বে মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কারও হাতে যদি ডলার না থাকে, সে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে (প্রায়) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন ইরান)। এমনকি আমেরিকা চাইলে একটি দেশকে ডলার ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শাস্তি দিতে পারে (ভেনেজুয়েলা, ইরান, রাশিয়া)। সব মিলিয়ে ডলারে বাণিজ্যব্যবস্থা আমেরিকাকে অন্যতম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

পাচার ও মানি লন্ডারিং

একজন ব্যবসায়ী যখন বিদেশে কারখানা খোলে, যেমন অ্যাপল কোম্পানি চীনে যন্ত্রাংশ প্রস্তুত কারখানা নির্মাণ করে অথবা শাওমি কোম্পানি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলি ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে, তখন তাদের বিনিয়োগ করতে হয়। এভাবে আমেরিকা থেকে টাকা চীনে বা চীন থেকে টাকা বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়। এগুলো হচ্ছে বস্তুগত সম্পদে সরাসরি বিনিয়োগ। বিদেশি প্রতিষ্ঠান চাইলে একটি দেশের পুঁজিবাজারেও বিনিয়োগ করতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে বস্তুগত সম্পদ সরাসরি কেনা হচ্ছে না, এটাও একপ্রকার বিনিয়োগ। কারণ, এর মাধ্যমে সম্পদের ওপর অধিকার হাতবদল হচ্ছে (বা পরোক্ষভাবে বস্তুগত সম্পদ কেনা হচ্ছে)। এভাবে এক দেশের থেকে টাকা আরেক দেশে স্থানান্তরিত হয়। এগুলোও ক্যাপিটাল ট্রান্সফারের অংশ।

কেবল বিদেশে বিনিয়োগ নয়, ভ্রমণ, বসবাস, চিকিৎসা, পড়াশোনাসহ নানা কারণে মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা নেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিছু কিছু দেশের সরকার বিদেশে টাকা দেওয়া-নেওয়া অনুমোদন করে না কিংবা অনেক শর্ত সাপেক্ষে এগুলোর অনুমোদন দেয়। এমতাবস্থায় নাগরিকেরা যদি শর্ত ভঙ্গ করে টাকা এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত করে, আমরা তাকে বলি টাকা পাচার করা। অর্থাৎ যে সকল দেশে ক্যাপিটাল ট্রান্সফার উন্মুক্ত (প্রায় সকল উন্নত রাষ্ট্র), সেই সকল দেশে পাচার বলে কোনো ধারণা নেই। কেবল যে সকল দেশ ক্যাপিটাল ট্রান্সফারের জন্য উন্মুক্ত নয়, সেই সকল দেশ থেকেই টাকা পাচার হয়।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ক্যাপিটাল ট্রান্সফারের দেশ থেকেও গোপনে টাকা সরাতে হয়; যেমন মাদক বিক্রির আয়, কর ফাঁকি দেওয়া টাকা ইত্যাদি। তাই উন্মুক্ত অর্থনীতিতে টাকা পাচার বলতে সাধারণত মানি লন্ডারিংকে বোঝানো হয়।

দুর্নীতি এবং পাচার গভীরভাবে একে অপরের সাথে জড়িত। দুর্নীতি দ্বারা অর্জিত সম্পদ সংরক্ষণ করা কষ্টকর। কারণ, ক্ষমতাকেন্দ্রিক দুর্নীতি যারা করে, তারা ক্ষমতার পালাবদলে সম্পদ জব্দ হয়ে যাওয়ার ভয় করে। অপর পক্ষে সার্বিক দুর্নীতির দায়ে যারা দায়ী, তারা কোর্টে দোষী সাব্যস্ত প্রমাণিত হলে জেল-জরিমানা হতে পারে। সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবৈধ উপার্জনকারী ব্যক্তিরা কীভাবে নিরাপদে সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারবে, তা নিয়ে চিন্তিত থাকে। এ কারণেই এক দেশ থেকে টাকা তুলে তারা আরেক দেশে পালিয়ে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্নে বিভোর থাকে। অনেকটা অতীতকালে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়িতে সিঁধ কেটে বহু দূরে নতুন জীবন শুরু করার মতন, যেখানে চুরির দাগ খুঁজে পাবে না কেউ।

বিদেশে সম্পদ পাচার করার একটি উপকারী দিক হলো, সেখানে ক্ষমতার পালাবদলে সম্পদ হারানোর ভয় থাকে না। যে যে দেশের সম্পদ সেই সেই দেশের আইনে নিরাপদ থাকে। বাংলাদেশে কে কী করে সম্পদ অর্জন করেছে, তা ব্রিটিশদের দেখার বিষয় নয়। বাংলাদেশের আইনে ব্রিটেনে বিচার হয় না। আবার আমেরিকার আইনে মেক্সিকোতে বিচার হয় না। তাই বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে কিংবা আমেরিকা থেকে মেক্সিকোতে খুঁটি গাড়তে পারলেই সম্পদ নিরাপদ হয়।

তবে এই বিষয়গুলো বর্তমানে তুলনামূলক জটিল আকৃতি ধারণ করেছে। এক দেশ থেকে পালিয়ে আরেক দেশে নিরাপদে থাকা আগের মতন অতটা সহজ নয়। যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো, যেমন আমেরিকা ও ব্রিটেন, তাদের এক দেশের থেকে টাকা চুরি করে আরেক দেশে গেলে কোর্টে তার বিচার হতে পারে। আবার কোনো দেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আমেরিকা, ব্রিটেন বা অন্য কোনো রাষ্ট্র সেই দেশের ক্ষমতাসীনদের সম্পদ জব্দ বা কবজা করতে পারে। রাশিয়া, ইরান, ভেনেজুয়েলাসহ অনেক দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বারা এমনটা করতে দেখেছি আমরা।

এই সকল কারণে অবৈধ উপায়ে উপার্জিত কালো টাকাকে আগে সাদা করে নিতে হয়। ইংরেজিতে একে বলে মানি লন্ডারিং। লন্ডারিং শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে ধোলাই করা। সেই হিসেবে মানি লন্ডারিং শব্দটির অর্থ হচ্ছে টাকা ধোলাই করা। আমার ধোপার কাছে ময়লা কাপড় জমা দিলে ধোপা সাহেব যেমন কাপড় ধোলাই করে ময়লা পরিষ্কার করে দেয়, ঠিক তেমনি কালো, অবৈধ টাকাকে ফাইন্যান্সিয়াল কারসাজির মাধ্যমে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার নামই মানি লন্ডারিং বা টাকা ধোলাই করা।

বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন, তখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা বিনিয়োগ করতে তাদের প্রচুর পরিমাণ কর প্রদান করতে হয়। আমরা যেমন ভিসা-পাসপোর্টের ঝামেলা এড়াতে এক দেশের থেকে আরেক দেশে চোরাই পথে পাড়ি দিই, ঠিক তেমনি করের ঝামেলা এড়াতে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন চোরাগোপ্তা উপায়ে টাকা স্থানান্তর করে। সমস্যা হচ্ছে, এই উপায়ে পাঠানো টাকার তথ্যপ্রমাণ মিললে জরিমানা গুনতে হয়। তাই তথ্য গোপন করতে এবং কাজের সব প্রমাণ মুছে ফেলতে ধৌতকার্য সম্পন্ন করতে হয়, ইংরেজিতে একেই বলে মানি লন্ডারিং।

মানি লন্ডারিং বা টাকা পাচার করার আরেকটি প্রেরণা হচ্ছে সরকার কর্তৃক বিদেশে টাকা প্রেরণে বাধা প্রদান করা। মনে করেন, কোনো দেশ আইন করল যে নাগরিকেরা বিদেশে যেতে পারবে না। সবাই তখন অবৈধ পথে বিদেশে যেতে চাইবে। একইভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশে টাকা পাঠানোর ব্যাপারেও অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে। বাংলাদেশ ছাড়া আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশেও ক্যাপিটাল কন্ট্রোল বা বিদেশে টাকা পাঠানোর ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আছে। এই সকল বাধা অতিক্রম করতে সম্পদশালী ব্যক্তি ও তাদের বুদ্ধিমান উপদেষ্টারা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছে। এমনই একটি উপায় হচ্ছে স্প্যাম ওয়েবসাইট ও অবৈধ ব্যবসা। বাংলাদেশ থেকে অনেকে স্প্যাম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে। কেউ কেউ আবার বিদেশে বসে জুয়া, অবৈধ ব্যবসা করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে; যে টাকা তারা দেশে আনতে পারে না। টাকা আনতে গেলেই উৎস সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আবার কালোটাকা বিদেশে রাখাও অনিরাপদ। তাই তারা চেষ্টা করে বাংলাদেশে টাকা আনতে। এদিকে বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজরাও চেষ্টা করে তাদের টাকা বিদেশে নিতে। সমাধানস্বরূপ এরা দুজন নিজেরা নিজেদের মধ্যে টাকা লেনদেন করে নেয়। এভাবে উভয়ে খুশি হয়। তবে এই লেনদেন নিরাপদ করতে মানি লন্ডারিংয়ের সাহায্য নিতে হয়। দেখা যায়, নিজেদের ভেতরে ব্যবসার নামে তুচ্ছ কিছু লেনদেনে বা মিথ্যা লোকসান দেখিয়ে তারা কাজ সারে। এভাবে সরকারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে তারা। তবে সরকারেরও গোয়েন্দা বাহিনী আছে। তারা এসব অনুসন্ধান করে বেড়ায়। সেজন্য টাকা পাচারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

ব্যবসা করে টাকা পাচার বা মানি লন্ডারিংয়ের একটি পন্থা হচ্ছে ভুয়া বাণিজ্য। মনে করুন, আপনি ১ মিলিয়ন ডলার বিদেশের ব্যাংকে বা

ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে জমা রাখতে চান। কিন্তু সরকার এই ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। আপনি তখন আপনার পরিচিত ভাই বা বন্ধুকে বললেন, 'তুমি এক কনটেইনার পুরাতন টিভি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও।' এই পুরাতন টিভির কোনো মূল্য নেই বাস্তবে। কিন্তু আপনি ভান দেখালেন ১ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এই মাল আপনি কিনে এনেছেন। আপনি টিভি ব্যবসায়ী না, কিছু না। কিন্তু সরকার জানল যে আপনি এক মিলিয়ন ডলারের টিভি কিনেছেন। কাস্টম কর্মকর্তাও দেখল কনটেইনারে অবৈধ কোনো পণ্য নেই। এভাবে পোর্টে মাল খালাস হয়ে গেল। তারপর আপনি আপনার বন্ধুকে পারিশ্রমিক হিসেবে ১ হাজার ডলার দিলেন এবং বাকি টাকা বিদেশি ব্যাংকে জমা করে রাখলেন; খুব সুন্দর উপায়ে মানি লন্ডারিং হয়ে গেল। বিদেশি সরকার জানতে পারল যে আপনি তাদের দেশ থেকে পণ্য কিনেছেন। তাই আপনার টাকা বৈধ উপায়ে সেই দেশে আসছে। বাংলাদেশ সরকার জানল আপনি ব্যবসায়ী। কিন্তু আপনি মূলত ব্যবসার ছায়ায় টাকা প্রেরণ করেছেন। একইভাবে আপনিও বিদেশে পণ্য রপ্তানি করবেন এবং সে এভাবে দেশে টাকা পাঠাবে।

তবে বর্তমানে এই উপায় একটু কঠিন হয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ট্রেড লাইসেন্স যাচাই করে দেখা হয়। আপনার কোনো ব্যবসা নেই, আপনি একজন ঠিকাদার। কিন্তু হুট করে মাল অর্ডার দিলেন, এমন দেখা গেলে সন্দেহের তালিকায় পাঠানো হবে। এই সমস্যা বাইপাস করার জন্যও আবিষ্কার হয়েছে নতুন নতুন পদ্ধতি। এর নাম ওভার ইনভয়েসিং।

মনে করেন, আপনি ১ মিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক ১.৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করলেন। যিনি কিনলেন, তিনি সামান্য কিছু লাভ নিয়ে আপনাকে বাকি টাকা ট্রান্সফার করে দিলেন। কোনো ক্রেতা যদি বেশি দামে পণ্য কেনে এবং বিক্রেতা বেশি দামে বিক্রি করতে পারে, সে ক্ষেত্রে আইনত কিছু বলার নেই। তাই যদিও একটি বস্তুর প্রকৃত দাম ১ মিলিয়ন, আপনি প্রতি শিপমেন্টে আধা মিলিয়ন বাড়তি লাভ দেখিয়ে সম্পদ পার করে দিলেন। অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশি একজন ব্যক্তিই বিদেশে পরিবারের কারও নামে একটি দোকান খুলে বাংলাদেশ থেকে নিজে পণ্য বেশি দামে এলসি করে টাকা পাচার করছে। এই সমস্যা এড়াতে পণ্যের বাজারমূল্যের সাথে এলসি মূল্য মিলিয়ে দেখা হয়। বড় অসংগতি দেখা দিলে জবাবদিহি করতে হয়। সব মিলিয়ে মানি লন্ডারিং আগের তুলনায় অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। তবে নতুন পরিস্থিতির সাপেক্ষে আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন পদ্ধতিও। সেগুলো ধরতে আসছে আরও নতুন নতুন আইনকানুন। সব মিলিয়ে টাকা পাচার একটি চোর-পুলিশ খেলা, যার উভয় পাশেই বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞ ও

আইনজীবীরা কাজ করে যাচ্ছেন; কে কাকে ফাঁকি দিতে পারবে এবং কে কাকে কীভাবে ধরতে পারবে।

তবে মানি লন্ডারিং সম্ভবত আয়করকে ফাঁকি দিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু দেশে আয়কর খুব কম থাকে। তাই বড় বড় ধনী ব্যক্তি ও ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড পানামা দ্বীপ, কেম্যান দ্বীপ, আইল অব ম্যান ইত্যাদিতে হেডকোয়ার্টার খুলে সম্পদ পার করে। এই সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে বেনামে ও ট্যাক্স ছাড়া পার করার চেষ্টা চলে। সব মিলিয়ে মানি লন্ডারিং ও টাকা পাচার সম্পদশালীদের একটি রুটিনমাফিক কাজ এবং বড় বড় আইনজীবী ও ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞ তাতে নিবিড়ভাবে সাহায্য করে। অনেক বড় বড় ব্যাংকও মানি লন্ডারিং কাজে সরাসরি জড়িত ছিল এবং আছে।

ব্যালেন্স অব পেমেন্টস

ব্যালেন্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিক্তি। একটি নিক্তিতে ওজন পরিমাপ করলে যেমন দুই পাশ সমান হয়, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক লেনদেনের সারমর্ম বা ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের দুই পাশ সমান হয়।

মনে করেন, বাংলাদেশের একটি শিপিং কোম্পানি চীন থেকে একটি জাহাজ কিনল। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য আমদানি। এই আমদানির ফলে বাংলাদেশ ডলার (বা অন্য যেকোনো বৈদেশিক মুদ্রা) হারাবে এবং চীন ডলার অর্জন করবে। আবার মনে করেন স্পেন বাংলাদেশ থেকে পাট কিনল। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি। এই রপ্তানির ফলে স্পেন ডলার হারাবে এবং বাংলাদেশ ডলার অর্জন করবে।

পণ্যের মতো সেবাও আমদানি-রপ্তানি করি আমরা। এই যেমন আমেরিকার একটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের কোনো মার্কেটিং এজেন্সিকে পরামর্শ সেবা প্রদান করল। এটি বাংলাদেশের জন্য আমদানি। এই লেনদেনে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে ডলার যাবে। আবার ধরুন, বাংলাদেশের কোনো একজন উদ্যোক্তা আমেরিকাতে পাবলিক লেকচার দিয়ে আয় করল। এটি বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি। এই লেনদেনে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ডলার আসবে। পণ্য ও সেবার সম্মিলিত আমদানি রপ্তানিকে একত্রে বলে বাণিজ্য। বছর শেষে সম্মিলিত বাণিজ্যের ফলাফল (রপ্তানি বিয়োগ আমদানি) যদি ঋণাত্মক হয়, আমরা বলি দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি চলছে। আবার যদি রপ্তানি থেকে আমদানির বিয়োগফল ধনাত্মক হয়, আমরা বলি দেশটিতে বাণিজ্য উদ্বৃত্তি চলছে।

কেবল বাণিজ্যই সবকিছু নয়। রেমিট্যান্স, অনুদান, ব্যবসা আয়সহ বিভিন্ন ধরনের নিত্যনৈমিত্তিক লেনদেন ডলারের আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করে। এই যেমন কানাডা থেকে কেউ বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠালে তা আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে (রিজার্ভে) যোগ হয়। আবার বাংলাদেশ

থেকে কেউ বিদেশে টাকা পাঠালে তা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার (রিজার্ভ) থেকে বিয়োগ হয়। এভাবে যত প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে যায়, সব হচ্ছে বহির্গমন এবং যত প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশের ভেতরে প্রবেশ করে, সব হচ্ছে অর্জন। এই অর্জন-বর্জনের সম্মিলিত হিসাবকে বলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স।

একটি নিক্তির দুই পাশে যেমন দুটি ভিন্ন পাল্লা থাকে, ঠিক তেমনি ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের এক পাশে থাকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং আরেক পাশে থাকে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি আয় নিয়ে। এবার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের দিকে নজর দেওয়া যাক। ধরুন, কাতার বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগ করল। এর ফলে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশ করল। আবার ধরুন, বাংলাদেশের একজন ব্যক্তি আমেরিকাতে বাড়ি কিনল। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আমেরিকাতে গেল। এগুলো সবই স্থায়ী বিনিয়োগ। এ-জাতীয় স্থায়ী বিনিয়োগগুলো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের অংশ। আরেক ধরনের বিনিয়োগ আছে, যেখানে একজন ব্যক্তি সরাসরি সম্পদ কেনেন না, কিন্তু তিনি সম্পদের অধিকার কেনেন; যেমন শেয়ার, বন্ড, অপশন ইত্যাদি কেনা। এগুলো সবই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল বিনিয়োগ। এই ফাইন্যান্সিয়াল বিনিয়োগগুলোও আন্তর্জাতিক লেনদেনের অংশ, যা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে যুক্ত হয়। সবশেষে একটি দেশ যদি বিদেশি অনুদান বা ঋণ পায়, তা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয় এবং একটি দেশ যদি ঋণ বা অনুদান দেয়, তা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়োগ হয়। এই সকল আদান-প্রদানের সম্মিলিত ফলাফলকে একত্রে বলা হয় ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স।

আন্তর্জাতিক লেনদেন নিক্তি বা ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের এক পাশে থাকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং আরেক পাশে থাকে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট (বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ ও রিজার্ভ)। এই দুই পাশের ওজন সমান হয়। অর্থাৎ, একটি দেশের থেকে চলতি আয় হিসেবে যা কিছু বের হয়, তা আবার বিনিয়োগ, ঋণ, অনুদান ইত্যাদি আকারে ফেরত আসে। আবার যদি চলতি আয় হিসেবে বাড়তি প্রবেশ করে, তাহলে তা বিনিয়োগ, ঋণ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে যায়। শুনতে খটকা লাগছে? খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে সকল দেশে বাণিজ্য ঘাটতি বেশি, সেই সকল দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ বেশি হয়। আর যে দেশগুলোতে বাণিজ্য উদ্বৃত্তি চলছে, সেই

দেশগুলো বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ এবং ঋণ প্রদান বেশি করে। কিন্তু যদি এমনটি না হয়?

ধরুন, কোনো দেশে বাণিজ্য উদ্বৃত্তি আছে কিন্তু সেই দেশে কেউ বিনিয়োগ করছে না বা তাদের কেউ ঋণ দিচ্ছে না। এর ফলাফল কী হবে? এক্ষেত্রেও কি ব্যালেন্স অব পেমেন্ট মিলে যাবে?

জি, এক্ষেত্রেও ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের দুই পাশ সমান হবে। কারণ, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও বিদেশি বিনিয়োগের পার্থক্য রিজার্ভের সাথে যোগ বা বিয়োগ হয়ে যায় এবং এভাবেই নিক্তির উভয় পাশ সমান হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বছর একটি দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং বিদেশি বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদান + ৪৫ বিলিয়ন ডলার হলে সেই বছর দেশটির রিজার্ভ ৫ বিলিয়ন ডলার কমে যাবে। অপর পক্ষে কোনো দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স + ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং বিদেশি বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদান ৩৫ বিলিয়ন ডলার হলে দেশটির রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে যাবে। এভাবে ব্যালেন্স অব পেমেন্টস উভয় পাশ সব সময় সমান হবে।

1. Exports	250.5
2. Imports	-381.1
3. Trade balance (2 – 1)	**-130.6**
4. Invisibles (net)	84.6
(a)Non-factor income	48.8
(b)Income	-17.3
(c)Pvt. Transfers	53.1
5. Current account balance (3 + 4)	**-45.9**
6. External assistance (net)	4.9
7. Commercial borrowing (net)	12.5
8. Short-term debt	11.0
9. Banking Capital of which	4.9
NR deposits (net)	3.2
10. Foreign investment (net)	39.7
Of which:	
(i) FDI (net)	9.4
(ii)Portfolio	30.3
11. Other flows (net)	-11.0
12. Capital account total (net)	**62.0**
13. Errors and Omissions	-3.0
14. Balance of payments [5 + 12+13]	**13.1**
15. Reserve use (- increase)	-13.1

An example of Balance of Internatinal Payments with respect to India

চিত্র : ভারতের ব্যালেন্স অব পেমেন্টস

টীকা : রিজার্ভ

বাসাবাড়িতে আমরা যখন আলমারিতে টাকা রেখে খরচ করি, তখন আমরা ড্রয়ারের থেকে টাকা বের করি এবং আয় হলে টাকা ড্রয়ারে ভরি। এই আয়-ব্যয়ের মাঝে কিছু টাকা সব সময় ড্রয়ারে জমা থাকে। সংসারে যদি আয়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে, আলমারিতে (বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে) জমা হওয়া টাকার পরিমাণও বাড়তে থাকে। আবার সংসারের আয়রোজকার যদি কমে আসে, আলমারিতে (বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে) টাকার পরিমাণও কমতে থাকে। একইভাবে একটি রাষ্ট্রের আয়কৃত ডলারের তুলনায় ব্যয় কম হলে রাষ্ট্রটির হাতে ডলারের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং আয়কৃত ডলারের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে সঞ্চিত ডলারের পরিমাণ কমতে থাকে।

রাষ্ট্রের হাতে থাকা ডলারের এই সমষ্টিকেই ইংরেজিতে বলে রিজার্ভ। রিজার্ভ শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে সঞ্চয়। ডলারের এই সঞ্চয় বিপদের দিনে কাজে লাগে। কোনো দিন যদি আয় কমে যায় বা ব্যয় বেড়ে যায়, তখন তারা এখান থেকে ডলার খরচ করতে পারে। সাধারণত আমরা ঘরে টাকা অলস ফেলে না রেখে ব্যাংকে জমা রাখি এবং সুদ পাই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও কথাটা সত্য। সেজন্য একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিন্দুকে ডলার না রেখে মার্কিন সরকারের সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে। এই সঞ্চয়পত্রগুলো খুব নিরাপদ এবং সুদের হার সর্বনিম্ন। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো চাইলে সরকারি সঞ্চয়পত্রের পাশাপাশি কিছু ডলার দিয়ে আমেরিকার গৃহঋণ বা করপোরেট সঞ্চয়পত্রও কিনে রাখতে পারে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশাল অঙ্কের রিজার্ভ ডলারে সঞ্চিত না রেখে বিভিন্ন সম্পদের ঝুলিতে যেমন ইয়োরো, ইয়েন, স্বর্ণ ইত্যাদিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে বা রিজার্ভের কিছু অংশ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগও করে। এতে সম্পদের ঝুলিতে বৈচিত্র্য বা ডাইভার্সিটি আসে। এই সমস্ত সম্পদ ও ঋণের সম্মিলিত পরিমাণকেই ইংরেজিতে বলে রিজার্ভ বা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ।

সবশেষে আলোচনা করি একটি বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে। সেটা হচ্ছে মুদ্রার দাম বাড়া-কমা। মনে করেন, কোনো দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে + ৪৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে; কিন্তু দেশটির কোনো রিজার্ভ নেই। এক্ষেত্রে কী হবে? এক্ষেত্রেও স্বদেশি টাকার মান পড়ে যেতে থাকবে। তখন টাকার মান যত বাড়ে বা কমে, তাকে ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুই পাশ মেলানো হবে। এবার চিন্তা করুন, কোনো দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স + ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে + ৫৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে; কিন্তু তারা রিজার্ভ না বাড়িয়ে ডলার বিক্রি করে টাকা কেনা শুরু করল। তখন কী হবে? উত্তর হচ্ছে, তখন ডলারের বিপরীতে টাকার মান বেড়ে যাওয়া শুরু করবে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে মুদ্রার দরপতন নিবিড়ভাবে

জড়িত। অনেক সময় দেখা যায়, একটি দেশের সরকার বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার পর দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় দেশটিতে যদি আশানুরূপ বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ, অনুদান ইত্যাদি না আসে, বাধ্যতামূলকভাবেই দেশের রিজার্ভ কমে যাবে অথবা দেশটির মুদ্রার মান পড়ে যাবে।

মুদ্রার দরপতন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে আপনাদের নিকট 'গল্পে গল্পে অর্থনীতি বই' থেকে একটা অধ্যায় সংযুক্ত করলাম নিচে।

মুদ্রার দর পরিবর্তন

সুখ সাগর এবং শান্তি নগর পাশাপাশি দুটি রাজ্য। এই দুই রাজ্যের মাঝে কেনাবেচা হয় রুপার মুদ্রায়। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল, এমন সময় শান্তি নগরের একজন বিজ্ঞানী নতুন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই যন্ত্র গাড়ির সাথে লাগালে আর ঘোড়ার প্রয়োজন হয় না, যন্ত্রই গাড়ি টেনে নেবে। যন্ত্রটি আবিষ্কার করার পর বিজ্ঞানী সাহেব একজন ব্যবসায়ীর সাথে আলোচনা করলেন এবং যৌথ উদ্যোগে তারা একটি কারখানা খুললেন। তারপর তারা এই যন্ত্রচালিত গাড়ি বিক্রি করা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে সবাই ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে যান্ত্রিক গাড়ি কেনা আরম্ভ করল।

এভাবে প্রযুক্তিগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে সুখ সাগর শান্তি নগরের তুলনায় পিছিয়ে পড়ল। এর ফলে শান্তি নগরের রপ্তানি বেড়ে গেল এবং সুখ সাগরের আমদানি বেড়ে গেল। যেহেতু দুটি দেশেরই সাধারণ মুদ্রা রুপা, সকল লেনদেন রুপা দিয়ে হওয়ায় সুখ সাগর থেকে সকল রুপা শান্তি নগরে চলে যেতে থাকল।

সুখ সাগরের মুদ্রা যখন শেষ হয়ে আসবে, তারা সঞ্চয় ভেঙে ব্যয় করবে। সঞ্চয় না থাকলে তারা শান্তি নগর থেকে ঋণ নেবে। কারণ, তাদের শান্তি নগরের কাছে বাড়তি মুদ্রা আছে। এভাবে সুখ সাগর রাজ্যটি ঋণগ্রস্ত হতে থাকবে। ঋণ নেওয়া ব্যতীত আরেকটি ঘটনা ঘটতে পারে, তা হলো সম্পদ বিক্রি করে মুদ্রা সংগ্রহ করা। এভাবে সুখ সাগরের সম্পদ শান্তি নগরের অধিবাসীদের কাছে যেতে থাকবে এবং এর বিনিময়ে সুখ সাগরের অধিবাসীরা মুদ্রা অর্জন করে বাণিজ্য চালিয়ে যাবে।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখব ওপরের উদাহরণের মতোই কোনো দেশে মুদ্রা (ডলার) ঘাটতি দেখা দিলে তারা বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (ফরেক্স রিজার্ভ) ভেঙে কাজ চালায়। অথবা ঋণ নেয়, অথবা সম্পদ বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে (বিদেশি বিনিয়োগ বা foreign

investment)। তবে ওপরের গল্পের সাথে বর্তমান বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে বর্তমানে সব দেশের অভ্যন্তরে এক রকম মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না। একেক দেশের অভ্যন্তরে একেক রকম মুদ্রা চালু আছে। তাই এক দেশের মুদ্রা আরেক দেশে চলে না। যেমন সুইজারল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক বাংলাদেশে চলে না। আবার বাংলা টাকা সুইজারল্যান্ডে চলে না। তার মানে এক দেশের টাকা আরেক দেশে চলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং প্রত্যেক দেশের টাকা নিজ নিজ দেশেই নিশ্চিতরূপে থাকবে। সে ক্ষেত্রে ওপরের আলোচনা কি প্রাসঙ্গিক?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আবারও সুখ সাগর এবং শান্তি নগরে নজর দিই। এবারে মনে করি, সুখ সাগরের মুদ্রায় রাজা প্রশান্তের এবং শান্তি নগরের মুদ্রায় রানি শান্তনার স্বাক্ষর করা আছে। এক দেশের মুদ্রা আরেক দেশে চলে না।

এখন হিসাবটা অনেক জটিল হয়ে গেছে। যেহেতু দুটি ভিন্ন দেশের মধ্যে সাধারণ মুদ্রা নেই, আগের মতো সহজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি মধ্যস্বত্বতাকারী প্রতিষ্ঠান। আনন্দ নামে একজন ব্যাংকার দুই দেশের সাথেই ভালো সম্পর্ক রাখে এবং উভয় দেশের ব্যাংকিং সেক্টরেই তার দৃঢ় উপস্থিতি রয়েছে। সে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আপনাদের সমস্যা নিরসনে আমি মাধ্যম হিসেবে কাজ করি। আপনাদের দেনা-পাওনা আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমি দেখছি।'

এভাবে শান্তি নগরের কোনো ব্যক্তি সুখ সাগরের কোনো ব্যবসায়ীর থেকে পণ্য কিনতে চাইলে আনন্দের ভায়া হয়েই লেনদেন করে। প্রথমে যেহেতু দুই পাশে মুদ্রার লেনদেন গড়পড়তা সমান ছিল, সব মিলিয়ে আনন্দের ব্যাংকে উভয়ের মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের একটা ভারসাম্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর ইঞ্জিনচালিত যান তৈরি হয়ে গেল। তখন আনন্দের ব্যাংকে প্রশান্তের মুদ্রার পাহাড় জমা হলো কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্রেতা খুঁজে পাওয়া গেল না, ওদিকে শান্তনার মুদ্রার চাহিদা গগনচুম্বী কিন্তু কোনো বিক্রেতা পাওয়া গেল না। বিক্রেতা আছে কিন্তু ক্রেতা নেই, সরবরাহ আছে কিন্তু চাহিদা নেই, এমন পরিস্থিতিতে ইতিহাসে সব সময় যা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তা-ই হবে। প্রশান্তের মুদ্রার দাম পড়ে যাবে।

এমনি করেই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করে থাকে। কোনো একটি দেশের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হলে সেই দেশকে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (রিজার্ভ) থেকে খরচ করতে হয়। সঞ্চয় শেষ

এলসির সাথে আমেরিকার আধিপত্যের সম্পর্ক

খোলাবাজারে আমরা যেভাবে ডলার কিনি, বড় বড় লেনদেনগুলো সেভাবে সম্পন্ন হয় না। আমদানি-রপ্তানি করতে ব্যাংকগুলোকে ডলার সঞ্চয় করে রাখতে হয়। সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো এই সঞ্চিত ডলার আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে ডিপজিট করে রাখে। আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে ডিপজিট করে রাখা ডলারের অ্যাকাউন্টকে বলে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করেন, আপনি একজন আমদানিকারক। চীন থেকে তুলা আমদানি করতে আপনি সুরমা ব্যাংকে এলসি খুলবেন। আপনার অর্ডার মোট ১০০ কোটি টাকার হলে সুরমা ব্যাংক গ্যারান্টর হয়ে চীনের জুং গুয়া ব্যাংকের সাথে আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন করবে।

দেখা গেল, তুলা কেনার এক দিন পর আপনি গায়েব হয়ে গেলেন, অথবা আপনার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেল। এক্ষেত্রেও চীন থেকে পণ্য সরবরাহ করার ১২০ দিনের মধ্যে চীনা ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারীকে ডলার দিয়ে দেবে। নিয়ম হচ্ছে, সুরমা ব্যাংক জুং গুয়া ব্যাংককে ডলার দেবে এবং জুং গুয়া ব্যাংক ডলার দেবে তুলার সরবরাহকারীকে। তাই আপনি দেউলিয়া হলে বা পালিয়ে গেলে সুরমা ব্যাংক লোকসান গুনবে। এজন্যই এলসি খোলার আগে ব্যাংক আপনার অবস্থা যাচাই-বাছাই করে নেয়। আপনি যদি সন্দেহজনক প্রমাণিত হন, ব্যাংক আপনার জন্য এলসি খুলবে না। এবার চিন্তা করে দেখুন, আপনার মতো আপনার ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে চীনের জুং গুয়া ব্যাংককে লোকসান গুনতে হবে। তাই এলসি খোলার সময় জুং গুয়া ব্যাংক সুরমা ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট দেখবে। সুরমা ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ডলার থাকে এবং লেনদেনের ইতিহাস ভালো থাকে, তাহলে লেনদেন করতে জুং গুয়া

ডলার ডিমান্ড

প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই ডলার হাতে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু ঋণমুক্ত উপায়ে একটি সাধারণ রাষ্ট্রের জন্য ডলার অর্জন করার উপায় হচ্ছে বাণিজ্য উদ্বৃত্তি। তবে এমনটা অসম্ভব যে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই বাণিজ্য উদ্বৃত্তিতে থাকবে। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে কল্পনা করুন আপনারা দুই (বা ততোধিক) বন্ধু একটি টেবিলে জুয়া খেলতে বসেছেন (যারা পোকার খেলতে পারেন, তারা মনে মনে ভাবতে পারেন পোকার খেলতে বসেছেন)। মনে করেন, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে ১০০ টাকা (বা পোকার খেলার চিপস) আছে। খেলার প্রতিটি দানে প্রত্যেক সদস্য ৫ টাকা করে টেবিলে রাখে। একটি দানে যে জিতে, সে একাই সব টাকা নিয়ে নেয়। যেহেতু টেবিলের মোট টাকার (বা চিপসের) পরিমাণ সীমিত, একজনের হাতে আসা টাকার পরিমাণ বাকিদের হাত থেকে কমে যাওয়া টাকার পরিমাণের সমান থাকে। একসাথে সবার দ্বারা টাকা আয় করা একেবারেই অসম্ভব; কারণ, খেলার নিয়মটাই এমনভাবে সাজানো যে কেউ জিতলে কেউ হারবে। সবাই একসাথে জিততে পারবে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ময়দানও ঠিক এমনিভাবে সেট করা। যেহেতু ডলারের পরিমাণ সীমিত, একটি দেশ ডলার অর্জন করছে মানে অপর দেশ ডলার হারাচ্ছে। তাই সকল রাষ্ট্রের অর্জিত ও হারানো ডলারের পরিমাণের যোগফল শূন্য (যেমনটা ওপরের জুয়ার টেবিলে আমরা দেখেছি)। এই কারণে কোনো দেশ ডলার অর্জন করলে অন্য কোনো দেশ ডলার হারায়। সবগুলো দেশ একসাথে ডলার অর্জন করতে পারে না।

পোকার খেলার চিপস ও জুয়ার টেবিলের টাকার সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য হচ্ছে এই যে আমেরিকা চাইলে বিশ্বে মোট ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ আমেরিকা নতুন ডলার ছাপিয়ে সিস্টেমে প্রবেশ (inject) করাতে পারে। ডলার ছাপিয়ে সিস্টেমে প্রবেশ করানোর

একটি মেকানিজম আছে। সেই মেকানিজমটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে আবারও জুয়ার টেবিলে ফেরত যাওয়া যাক।

মনে করি, টেবিল মাস্টার নতুন টাকা (বা চিপস) টেবিলে প্রবেশ করাতে পারেন। কিন্তু টেবিল মাস্টারের থলে থেকে সদস্যদের হাতে চিপস বা টাকা আসবে কীভাবে? এর একটি উপায় হচ্ছে ঋণ। মনে করেন, কোনো এক সদস্য খেলতে খেলতে সব টাকা খোয়াতে বসেছে। সেই খেলোয়াড় টেবিল মাস্টারকে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু টাকা ধার দিন, আমি খেলায় জিতে সুদে-আসলে সব ফেরত দেব।' খেলোয়াড়ের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টেবিল মাস্টার বলল, 'আর যদি ফেরত দিতে না পারেন?'

জবাবে খেলোয়াড় বলল, 'আপনি তো আমার হাতের মূল্যবান ঘড়িটি দেখছেন। সেইটা বন্ধক থাকল। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ঋণ দিন। ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারলে এই ঘড়ি আপনার হয়ে যাবে।' এভাবে টেবিলের বাইরে থেকে টেবিলে টাকা প্রবেশ করতে পারে এবং খেলার সময় দীর্ঘায়িত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, টেবিলের যে খেলোয়াড়ের হাতে বেশি টাকা আছে, সে চাইলে ফতুর জুয়াড়িকে ঋণ দিতে পারে। ওপরের উদাহরণে একজন জুয়াড়ি ফতুর জুয়াড়িকে বলতে পারে, 'আমার থেকে ঋণ নাও। পরে সুদে-আসলে ফেরত দেবে। আর যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারো, তোমার হাতঘড়িটি খুলে আমাকে দিয়ে দেবে।' এভাবে একজন খেলোয়াড় অপর খেলোয়াড়ের থেকে ঋণ নিয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধতে পারে।

প্রথম ঋণের সাথে দ্বিতীয় ঋণের পার্থক্য হচ্ছে প্রথম ঋণে টেবিলে মোট টাকার পরিমাণ সাময়িক সময়ের জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে টেবিলে মোট টাকার পরিমাণ কমে যাবে। দ্বিতীয় ঋণে টেবিলের মোট টাকার পরিমাণ সাময়িক সময়ের জন্য বৃদ্ধি পায়নি এবং ভবিষ্যতেও কমে যাবে না।

তৃতীয় আরেকটি উপায়ে টেবিলের সদস্যদের হাতে টাকা আসতে পারে। তা হচ্ছে টেবিল মাস্টার নিজে জুয়া খেলে হারতে থাকলে। যেহেতু সব টাকা টেবিল মাস্টারের হাতে, তিনি জুয়াতে অংশগ্রহণ করে হারতে থাকলে সদস্যদের হাতে নতুন টাকা প্রবেশ করবে। আবার তিনি জিততে থাকলে সদস্যদের হাত থেকে টাকা তার দিকে আসতে থাকবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ওপরের উদাহরণের মতো কাজ করে। আমেরিকা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের টেবিল মাস্টার। সে ঋণ, সুদের হার, ট্যারিফ, রেড টেপ ইত্যাদি দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করে, সেই আলোচনায় আমরা যাচ্ছি। আপাতত এতটুকু জানা যথেষ্ট যে-

১. প্রায় সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ডলারে হয়,
২. একমাত্র ফেডারেল রিজার্ভই ডলার ছাপানোর একচ্ছত্র অধিপতি এবং
৩. পৃথিবীর সব দেশ ডলার পেতে উন্মুখ হয়ে থাকে কিন্তু তারা সুদবিহীন উপায়ে খুব সীমিত পরিমাণ ডলার হাতে পায়।

এসডিআর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জুয়া খেলার পার্থক্য হচ্ছে জুয়াতে ভাগ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য অঙ্গনে ভাগ্যের তুলনায় দক্ষতা আরও বড় নিয়ামক। একটি দক্ষতাভিত্তিক খেলায় যে খেলোয়াড় যত দক্ষ, সে যেমন বেশি টাকা অর্জন করতে পারে, ঠিক তেমনি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অধিক সক্ষম, তারা অধিক ডলার অর্জন করতে পারে। এদিকে যে দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে, তারা কেবল রিজার্ভ খোয়াতেই থাকে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে ডলারে বাণিজ্য করা সমস্যাজনক হয়ে যায়। আমেরিকা নিশ্চয়ই চাইবে না ডলারভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাক। বরং সে চাইবে তার দেওয়া টোকেনে আন্তর্জাতিক খেলা চলতে থাকুক। *তাই বিপদে পড়া রাষ্ট্রকে ঋণ সরবরাহ করা বা অনুদান দেওয়া তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখারই একটি অংশ। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ঠিক এই কাজগুলোই করছে।*

মনে করেন, জুয়ার টেবিলে দশজন ব্যক্তি খেলছে। প্রথমজনের হাতে ৩০০ টাকা, পরবর্তী দুজনের প্রত্যেকের হাতে ২০০ টাকা, তার পরবর্তী চারজনের হাতে ৬০ টাকা, তার পরবর্তী দুজনের হাতে ৩০ টাকা এবং শেষজনের হাতে ০ টাকা আছে। এমন সময় টেবিল মাস্টার সবাইকে ৫০টি মুদ্রা দান করল। টেবিল মাস্টার কর্তৃক ৫০টি মুদ্রা দান হওয়ার পর সমীকরণ দাঁড়াল নিম্নরূপ–

প্রথমজনের হাতে ৩০০+৫০ টাকা, পরবর্তী দুজনের প্রত্যেকের হাতে ২০০+৫০ টাকা, তার পরবর্তী চারজনের হাতে ৬০+৫০ টাকা, তার পরবর্তী দুজনের হাতে ৩০+৫০ টাকা এবং শেষজনের হাতে ০+৫০ টাকা আছে। বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মিলিয়ে দেখেন। খেলোয়াড়দের হাতে নতুন টাকা প্রবেশ করাতে জুয়াতে অংশগ্রহণ করা যেমন সবার জন্য সহজ হয়ে গেল,

ঠিক তেমনি করে আইএমএফের এসডিআর হাতে প্রবেশ করাতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা খুব সহজ হয়ে গেল।

এবার আসুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএমএফ কেমন, আমরা সেই সম্পর্কে জানি। আইএমএফ হচ্ছে সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিষয়ে তারা তদারকি করে। আইএমএফের একটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তারা কোনো দেশের সরকার না হওয়া সত্ত্বেও একটি মুদ্রা ইস্যু করে। আইএমএফ কর্তৃক ইস্যুকৃত এই মুদ্রার নাম এসডিআর। এসডিআর এমন একটি মুদ্রা, যা ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় না। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রকে আইএমএফ নির্দিষ্ট পরিমাণ এসডিআর ভর্তুকি দেয়। যে দেশের জিডিপি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব যত বেশি, তাকে তত বেশি পরিমাণ এসডিআর ভর্তুকি দেওয়া হয়।

এসডিআর কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ব্যবহার করতে পারে। ডলারের মতো এটিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি মাধ্যম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে এসডিআর ভেঙে ডলারে বা অন্যান্য মুদ্রায় রূপান্তর করে নিতে পারে। কিন্তু কেনই-বা অপর কোনো দেশ এসডিআর গ্রহণ করবে, যার কোনো ব্যবহার নেই? সিস্টেমটা এমন, ধরি, দ্বীপরাষ্ট্র নাউরু আইএমএফের কাছ থেকে ১০০টি এসডিআর পেয়েছে। ওদিকে পর্বতরাষ্ট্র আদিগিয়া পেয়েছে ৫০টি এসডিআর। এখন তারা চাইলে এসডিআরের বিনিময়ে বাণিজ্য করতে পারে। মনে করি, নাউরু থেকে আদিগিয়া একটি উড়োজাহাজ কিনল। এর বিনিময়ে আদিগিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক নাউরুকে ১০টি এসডিআর দিল। ফলে নাউরু এর মোট এসডিআর হলো ১১০টি এবং আদিগিয়ার মোট এসডিআর হলো ৪০টি। খেয়াল করে দেখুন, আদিগিয়ার হাতে আইএমএফের দেওয়া ৫০টি এসডিআরের তুলনায় ১০টি কম আছে এবং নাউরুর হাতে নির্ধারিত ১০০টি এসডিআরের তুলনায় ১০টি বেশি আছে। তাই আদিগিয়া নাউরুকে ১০টি এসডিআরের ওপর সুদ দেবে। এই সুদের হার বাজারদর অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ এসডিআর অর্জন করলে সুদ পাওয়া যায় এবং এসডিআর হারালে সুদ দিতে হয়। এজন্য সবাই বেশি এসডিআর অর্জন করতে চায় এবং কম এসডিআর হারাতে চায়।

এবার মনে করেন, ডমিনিকান রিপাবলিক থেকে আদিগিয়া কিছু জাহাজ কিনবে। সে ৫টি এসডিআরের বিনিময়ে ডমিনিকান রিপাবলিক থেকে জাহাজ

অর্ডার করল। এর ফলে তার হাতে থাকবে মোট ৩৫টি এসডিআর। এখন থেকে আদিগিয়া মোট ১৫টি এসডিআরের ওপর সুদ দেবে। ডমিনিকান রিপাবলিক ৫টি এসডিআরের ওপর সুদ পাবে এবং নাউরু ১০টি এসডিআরের ওপর সুদ পাবে। এবার চিন্তা করে দেখুন, আদিগিয়া ১০০০ টন গ্রানাইট বিক্রি করে পূর্ব তিমুর থেকে ১০টি এসডিআর অর্জন করল। তারপরে কী হবে? এখন আদিগিয়ার হাতে আছে মোট ৪৫টি এসডিআর (নির্ধারিত ৫০টি এসডিআর থেকে ৫টি এসডিআর কম)। তাই সে 'নিট' ৫টি এসডিআরের ওপর সুদ প্রদান করবে।

এবার ধরা যাক, আরও কিছুদিন পর পাহাড়ি ভেড়ার মাংস রপ্তানি করে আদিগিয়া আরও ৫টা এসডিআর অর্জন করল। এখন তার হাতে আছে মোট ৫০টি এসডিআর, যা আইএমএফ কর্তৃক প্রদানকৃত এসডিআরের সমান। অর্থাৎ তার অবস্থান ব্যালেন্স হয়ে গেছে। তাকে আর সুদ দিতে হবে না (সুদরে দায় এবং সুদের আয়ের যোগফল শূন্য)।

এবারে বর্তমান বিশ্বের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক এসডিআর কীভাবে কাজ করে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন রিজার্ভ সংকটে পড়ে, তখন সে অপর কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এসডিআর বিক্রি করে ডলার (বা অন্য কোনো মুদ্রা) কিনতে পারে। ধরুন, গায়ানা সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে ৫০ বিলিয়ন ডলার, ৩ বিলিয়ন ইয়োরো এবং এক বিলিয়ন এসডিআর আছে। অপর পক্ষে সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে কেবল ১ বিলিয়ন ডলার এবং ২ বিলিয়ন এসডিআর আছে। এখন সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক গায়ানা সেন্ট্রাল ব্যাংককে বলল, আমার থেকে ১ বিলিয়ন এসডিআর নিন। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ১ বিলিয়ন ডলার এবং ২ বিলিয়ন ইয়োরো দিন। অথবা সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে পারে, আপনি আমার দেশকে এক বছরের জ্বালানি তেল সরবরাহ করেন, বিনিময়ে আমি আপনাকে ১ বিলিয়ন এসডিআর দেব। এভাবে এসডিআরের বিনিময়ে তারা লেনদেন করতে পারে। এখন যেহেতু সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসডিআর কমে গেল, সে গায়ানা সেন্ট্রাল ব্যাংককে প্রতিবছর সুদ দেবে। আর যেহেতু গায়ানা সেন্ট্রাল ব্যাংকের এসডিআর বেড়ে গেল, সে সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রতিবছর সুদ পাবে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ১ বিলিয়ন ডলার কিংবা ১ বিলিয়ন ইয়োরো খরচ করে তেল কেনে, তাহলে কোনো সুদ

দিতে হতো না। কিন্তু এসডিআরে লেনদেন করায় সুদ দিতে হচ্ছে। এ কেমন অবিচার?

আসলে এখানে নতুন করে কোনো অবিচার হচ্ছে না। ঘটনা হচ্ছে, রিজার্ভে থাকা ডলার বা ইয়োরোর ওপর সবাই সুদ পায়। কেউ তোশকের নিচে রিজার্ভ রাখে না। সবাই রিজার্ভের টাকায় সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে। তাই সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ১ বিলিয়ন ডলার থাকা মানে হচ্ছে সে নিয়মিত সুদ পাবে এবং এই ১ বিলিয়ন ডলার গায়ানাকে দিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে গায়ানা নিয়মিত সুদ পাবে। এভাবে সুরিনাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আয় কিছু কমবে ও গায়ানার আয় কিছু বাড়বে। ঠিক একই ঘটনা ঘটে এসডিআর বিনিময়ে করলে। সুরিনামের আয় বাড়ে এবং গায়ানার আয় কমে। উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিচে একটি অঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

ধরি, ডলার এবং এসডিআরে সুদের হার সমান। (সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাতে সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে এটাও সম্ভব যে এসডিআর এবং ডলারের সুদের হার একই)। ডলারে সুদের হার ১% হলে ১ বিলিয়ন ডলারে এক বছরে সুদ আসে ১০ মিলিয়ন ডলার। যেহেতু প্রথমেই সুরিনামের হাতে ছিল ২ বিলিয়ন ডলার, প্রতিবছর সে ২০ মিলিয়ন ডলার আয় করত। এখন যদি সে ১ বিলিয়ন ডলারের তেল কেনে, তার পরে আয় হয়ে যাবে ১০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ১ বিলিয়ন ডলারের তেল কেনায় সুরিনামের আয় কমবে ১০ মিলিয়ন ডলার।

এবার এসডিআরের হিসাব বোঝা যাক। যেহেতু এসডিআরে সুদের হার বছরে ১%, ১ বিলিয়ন এসডিআরের বিনিময়মূল্য হিসেবে প্রতিবছর কোকোকে সুদ দিতে হবে ১০ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থাৎ যে লাউ সেই কদু।

যদি এক এসডিআর = এক ডলার না হয়ে এক এসডিআর = ১.২ ডলার হতো, তখন এক বিলিয়ন ডলারে যে পরিমাণ তেল কেনা যেত, এক বিলিয়ন এসডিআরে তার ১.২ গুণ তেল কেনা যেত। আবার এক বিলিয়ন ডলার খরচ করলে যে পরিমাণ সুদ খোয়া যেত, এক বিলিয়ন এসডিআরে লেনদেন করলে তার ১.২ গুণ সুদ খোয়া যেত।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এসডিআরের গণিত অন্যান্য কারেন্সির মতো নয় কেন? ডলার-ইয়োরো দিয়ে যেভাবে লেনদেন করা যায়, এসডিআরে

সেভাবে লেনদেন করা যায় না কেন? যায় না, তার কারণ হচ্ছে ভোক্তা পর্যায়ে এসডিআরের কোনো ব্যবহার নেই। কোনো দেশের সরকার এসডিআরে বন্ড ছাড়ে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকে এসডিআর ডিপোজিট রাখা যায় না। তাই অন্যান্য মুদ্রার মতো এসডিআরে হিসাব মেলানো যায় না। কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নিজেদের মাঝে এসডিআর লেনদেন করে। সব মিলিয়ে সোনার সাথে এর বেশ কিছু মিল আছে। তবে একটি পার্থক্য হচ্ছে এই যে বর্তমান বিশ্বে সোনাতে সুদের লেনদেন হয় না, কিন্তু এসডিআরে হয়। আরেকটি বড় পার্থক্য হচ্ছে সোনার খনি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, কিন্তু এসডিআর কেবল আইএমএফ উৎপাদন করতে পারে। সবশেষে সোনা ছাপানো যায় না। কিন্তু এসডিআর ছাপানোর কোনো সীমা নেই।

এসডিআরের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয় এবং বাস্কেট কারেন্সি কী?

এসডিআরের মূল্য নির্ধারিত হয় এক ঝুড়ি বৈদেশিক মুদ্রার গড় মূল্য দিয়ে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৪৩.৩৮% ডলার, ২৯.৩১% ইয়োরো, ১২.২৮% চীনা মুদ্রা (রেনমেনবি), ৭.৫৯% জাপানি ইয়েন এবং ৭.৪৪% ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়ে গঠিত ঝুড়ির মূল্যই হচ্ছে এসডিআরের মূল্য। এই পাঁচটি মুদ্রার দর পরিবর্তনের সাথে সাথে ঝুড়ির সম্মিলিত দর বদলাতে থাকে। এভাবে এসডিআরের বাজারমূল্য পরিবর্তিত হতে থাকে। এই বই লেখাকালে এক এসডিআর = ১.৩৪ ডলার। অর্থাৎ এক এসডিআর হচ্ছে প্রায় ১৪৫ টাকা।

বাস্কেট কারেন্সির সদস্য কে কে হবে, তা প্রতি পাঁচ বছর পর নির্ধারিত হয়। শুরু থেকে এই পর্যন্ত অনেক রিজার্ভ কারেন্সি এসেছে এবং গিয়েছে। তাদের সম্মিলিত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

	USD
1971–1974[64]	1.0 (100%)

	USD	DEM	GBP	FRF	ITL	JPY	CAD	NLG	BEF	SAR	ESP	AUD	SEK	IRR	NOK	ATS
1974–1980[69]	0.4 (32.6%)	0.32 (10.2%)	0.05 (9.7%)	0.42 (7.1%)	52.0 (6.6%)	21.0 (6.0%)	0.07 (5.9%)	0.14 (4.3%)	1.6 (3.5%)	0.13 (3.0%)	1.5 (2.1%)	0.017 (2.1%)	0.11 (2.1%)	1.7 (2.0%)	0.1 (1.5%)	0.28 (1.3%)

	USD	DEM	FRF	JPY	GBP
1981–1985[64]	0.54 (42%)	0.46 (19%)	0.74 (13%)	34.0 (13%)	0.071 (13%)
1986–1990[64]	0.452 (42%)	0.527 (19%)	1.02 (12%)	33.4 (15%)	0.0893 (12%)
1991–1995[64]	0.572 (40%)	0.453 (21%)	0.8 (11%)	31.8 (17%)	0.0812 (11%)
1996–1998[64]	0.582 (39%)	0.446 (21%)	0.813 (11%)	27.2 (18%)	0.105 (11%)

	USD	EUR	JPY	GBP
1999–2000[64]	0.582 (39%)	0.3519 (32%)[70]	27.2 (18%)	0.105 (11%)
2001–2005[64]	0.577 (44%)	0.426 (31%)	21.0 (14%)	0.0984 (11%)
2006–2010[62]	0.632 (44%)	0.41 (34%)	18.4 (11%)	0.0903 (11%)
2011–2016[62]	0.68 (41.9%)	0.423 (37.4%)	12.1 (9.4%)	0.111 (11.3%)

	USD	EUR	CNY	JPY	GBP
2016–2022[71]	0.58252 (41.73%)	0.38671 (30.93%)	1.0174 (10.92%)	11.9 (8.33%)	0.085946 (8.09%)
2022–2027[72]	0.57813 (43.38%)	0.37379 (29.31%)	1.0993 (12.28%)	13.452 (7.59%)	0.080870 (7.44%)

চিত্র : এসডিআর বাস্কেট কারেন্সি (সূত্র : আইএমএফ ও ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, বিভাগে উইকিপিডিয়া)

এখন পর্যন্ত আইএমএফ খুব সীমিত পরিমাণে এসডিআর ছাপিয়েছে। নিচের গ্রাফে দেখতে পাচ্ছেন ২০২১ সাল পর্যন্ত বিশ্বে মোট ছাপানো এসডিআরের পরিমাণ ৪৫৬.৫ বিলিয়ন। সেই তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আকৃতি প্রায় ৩০,০০০ বিলিয়ন ডলার এবং আমেরিকার স্থূল মুদ্রা বা M2 প্রায় ২১,০০০ ডলার। সব মিলিয়ে বলা যায়, এসডিআর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় কোনো নিয়ামক নয়। এটি কেবল ডলারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার একটি লাইফ সাপোর্ট।

মোট এসডিআরের পরিমাণ

সময়কাল	পরিমাণ
১৯৭০–১৯৭২	এসডিআর ৯.৩ বিলিয়ন
১৯৭৯–১৯৮১	এসডিআর ১২.১ বিলিয়ন
২৮ আগস্ট ২০০৯	এসডিআর ১৬১.২ বিলিয়ন
৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯	এসডিআর ২১.৪ বিলিয়ন
৩ মার্চ ২০১১	এসডিআর ২০.৮ বিলিয়ন
২৩ আগস্ট ২০২১	এসডিআর ৪৫৬.৫ বিলিয়ন

ঋণের ফাঁদ

আমেরিকা থেকে যত ডলার বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে, তার একটি বড় অংশ সুদই ঋণ আকারে আসে। ঋণমুক্ত ডলার প্রবাহ যদি ঋণের সুদের তুলনায় বেশি হয়, একটি ভারসাম্য বজায় থাকা সম্ভব। তবে আমেরিকার দেওয়া ঋণের বিপরীতে যে পরিমাণ সুদ আসে, তা যদি আমেরিকা থেকে সুদমুক্ত উপায়ে বের হয়ে যাওয়া ডলারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব।

ব্যাপার হচ্ছে, এই ভারসাম্য রক্ষা বা ভাঙার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার হাতে। ধরুন, জুয়ার টেবিলের সদস্যরা টেবিল মাস্টারের হাত থেকে ৫০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। এর বিপরীতে ১০% হারে সুদ আসে ৫০ টাকা। কিন্তু টেবিল মাস্টার নিজে খেলায় অংশগ্রহণ করে প্রতি দানে ৬০ টাকা হারাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সুদে আসা টাকা < সুদমুক্ত নতুন টাকা।

ঠিক তেমনি করে, আমেরিকার দেওয়া ঋণের বিপরীতে যে পরিমাণ সুদ আমেরিকার দিকে আসে, যদি আমেরিকা থেকে সুদমুক্ত উপায়ে তার তুলনায় বেশি ডলার বের হয়, ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে। কিন্তু যদি তা না হয়, প্রতিবছর নির্দিষ্টসংখ্যক দেশ ডলারে দেউলিয়া হতে থাকবে বা তাদের ঋণের বোঝা বাড়তে থাকবে।

Total credit to non-bank borrowers by currency of denomination [1]: US dollar

Bank loans and debt securities issues, by residence of non-bank borrower

‹ Q2 2022 Level: 1 2 3 4 5	Amount outstanding (USD bn) Q4 21	Q1 22	Q2 22	Annual change (%) Q4 21	Q1 22	Q2 22
⊟ Borrowers outside the United States	13,422	13,382	13,257	5.5	3.3	[illegible]
⊞ Of which: emerging market economies	5,399	5,406	5,399	7.4	5.1	[illegible]
⊟ By instrument						
⊟ Borrowers outside the United States	13,422	13,382	13,257	5.5	3.3	[illegible]
Bank loans	6,162	6,136	6,070	4.0	2.7	[illegible]
⊟ Debt securities issues	7,260	7,247	7,187	6.8	3.9	[illegible]
Of which: non-financial borrowers	3,712	3,724	3,703	6.3	4.5	[illegible]
⊟ Of which: emerging market economies	5,399	5,406	5,399	7.4	5.1	[illegible]
Bank loans	2,920	2,901	2,890	5.8	3.5	[illegible]
⊟ Debt securities issues	2,479	2,505	2,509	9.3	7.1	[illegible]
Of which: non-financial borrowers	2,030	2,051	2,052	9.4	7.2	[illegible]

চিত্র : মার্কিন ডলারে নন-ব্যাংকঋণ (সূত্রঃ ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট)

ওপরের টেবিলটি লক্ষ্য করুন। ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের তথ্য অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বে মোট ১৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ ডলারে আছে। বর্তমানে এক বছরের ডলার ঋণে লাইবর বা london interbank offer rate হচ্ছে ৫.৪%। লাইবরকে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের সর্বনিম্ন সুদের হার। সেই হিসাবে ওপরের ঋণে ডলারের গড়পড়তা সুদের হার যদি ৬ শতাংশ ধরি, তাতে সুদ আসবে বছরে ৭৮০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বছরে ৭৮০ বিলিয়ন ডলার ঋণমুক্ত উপায়ে আসতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমেরিকার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট হচ্ছে মাত্র ২১৭ বিলিয়ন ডলার। তার মানে আমাদের ওপর যেই সুদের বোঝা প্রতিবছর বাড়ছে, সেই তুলনায় ডলার হাতে আসছে না। মনে করেন আপনি ঋণ করেছেন তেরো লক্ষ টাকার। এই ঋণে বছর বছর সুদ আসে ৭৮ হাজার টাকা। কিন্তু আপনার আয় ২১ হাজার টাকা। এর মানে কী? এর মানে আপনাকে প্রতি মাসে আরও বেশি ঋণ নিতে হবে অথবা দেউলিয়া হতে হবে।

জুহরির গল্পে আমরা যেমন দেখেছি, একটি বিশেষ মুদ্রা ঋণ দিয়ে বেশি পরিমাণ ফেরত চাইলে ঋণগ্রহীতারা দেউলিয়া হতে থাকে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডলারের ব্যাপারটাও তেমন। একমাত্র ডলারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হতে থাকলে আমেরিকা ডলারে ঋণ দেবে এবং বাড়তি ডলার ফেরত চাইবে। তাই সারা দুনিয়াকে বারবার আমেরিকার কাছে আসতে হবে এবং দিনে দিনে সবাই ঋণে জর্জরিত ও দেউলিয়া হতে থাকবে।

টীকা : বৈদেশিক ঋণ

একবার চিন্তা করে দেখুন, আমরা কেন ঋণ নিই। টাকার অভাববোধ থেকেই আমরা টাকা ঋণ নিই। কিন্তু যার হাতে টাকা নেই, সে কীভাবে বাড়তি টাকা ফেরত দেবে? নিশ্চয়ই অধিক টাকা উপার্জনের মাধ্যমে। এজন্য ঋণ নিয়ে আমাদের সুদের হারের চেয়ে অধিক হারে টাকা উপার্জন করতে হয়। ঠিক একইভাবে বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ নেওয়ার পর সুদের হারের চেয়ে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয়। অন্যথায় সরকারকে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়। তাই বিদেশি ঋণ কেবল রপ্তানি, রেমিট্যান্স বা বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থেই করতে হবে। এমনটা নিশ্চিত করতে না পারলে দেউলিয়াত্ব সুনিশ্চিতরূপে দরজায় কড়া নাড়বে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশ একসাথে বাণিজ্য উদ্বৃত্তিতে থাকতে পারে না। তাই বর্তমান ডলারকেন্দ্রিক বাণিজ্য ও ঋণব্যবস্থা একটি মহা ফাঁদ। প্রমাণ দেখতে চান? নিচে আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চার্টের খণ্ডিতাংশ দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, OECD (Organization of Economically Developed Countries) অন্তর্ভুক্ত যে দেশগুলো অতীতে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটে ভুগেছে (পূর্ণাঙ্গ লিংক ফুটনোটে)[২১] সেই দেশগুলোর অনেকেই তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যায় আছে, যেমন তুরস্ক, ব্রাজিল, চিলি; আর ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে গেছে গ্রিস (পূর্বে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের কলকব্জা অধ্যায়ে আপনারা দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রের লিস্টে এদের নাম দেখেছিলেন)। নিচে অপর দুই দেউলিয়া রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও লেবাননের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চার্ট আলাদাভাবে দেওয়া হলো। সেখানেও দেখতে পাচ্ছেন তারা কি পরিমাণ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটে ভুগেছে। ডলারকেন্দ্রিক বাণিজ্য যত দিন টিকে থাকবে, একের পর এক দেশকে এমন কঠিন পরিস্থিতির শিকার হতে হবে।

Current account balance Total, % of GDP, 2011 - 2020

Location	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	[illegible]
Türkiye	-8.82	-5.47	-5.83	-4.14	-3.16	-3.11	-4.68	[illegible]
Costa Rica	-5.30	-5.14	-4.81	-4.74	-3.40	-2.10	-1.57	[illegible]
India	-3.57 B	-5.07	-2.54	-1.36	-1.09	-0.54	-1.48	[illegible]
South Africa	-2.01	-4.69	-5.33	-4.83	-4.34	-2.68	-2.37	[illegible]
Chile	-2.72	-4.43	-4.70	-3.46	-2.74	-2.62	-2.76	[illegible]
Australia	-3.00	-4.36	-3.37	-3.04	-4.63	-3.30	-2.57	[illegible]
Poland	-5.09	-4.12	-1.97	-2.88	-1.28	-1.00	-1.13	[illegible]
New Zealand	-2.81	-3.93	-3.09	-3.12	-2.71	-2.06	-2.80	[illegible]
Iceland	-4.74	-3.61	6.22	4.34	5.62	8.01	4.23	[illegible]
Greece	-8.77	-3.54	-1.44	-0.74	-0.81	-1.75	-1.93	[illegible]
Canada	-2.72	-3.53	-3.14	-2.32	-3.50	-3.10	-2.80	[illegible]
Brazil	-2.92	-3.42	-3.23	-4.15	-2.89	-1.34	-1.06	[illegible]
Ireland	-3.64	-3.18	1.55	1.07	4.39	-4.21	0.49	[illegible]
United Kingdom	-1.80	-3.29	-4.78	-5.15	-5.07	-5.49	-3.81	[illegible]
Latvia	-2.73	-3.28	-2.90	-1.55	-0.49	1.73	1.37	[illegible]
Colombia	-2.90	-3.14	-3.24	-5.22	-6.32	-4.47	-3.18	[illegible]
Indonesia	0.20	-2.66	-3.17	-3.08	-2.03	-1.83	-1.59	[illegible]
United States	-2.92	-2.57	-2.02	-2.11	-2.24	-2.12	-1.85	[illegible]
Finland	-1.43	-2.05	-1.80	-1.33	-0.93	-2.00	-0.81	[illegible]
Estonia	1.28	-1.88	0.30	0.70	1.77	1.24	2.28	[illegible]
Portugal	-5.96	-1.60	1.63	0.16	0.23	1.17	1.30	[illegible]

চিত্র : OECD-র কিছু রাষ্ট্রের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চিত্র

21 https://data.oecd.org/trade/current-account-balance.htm
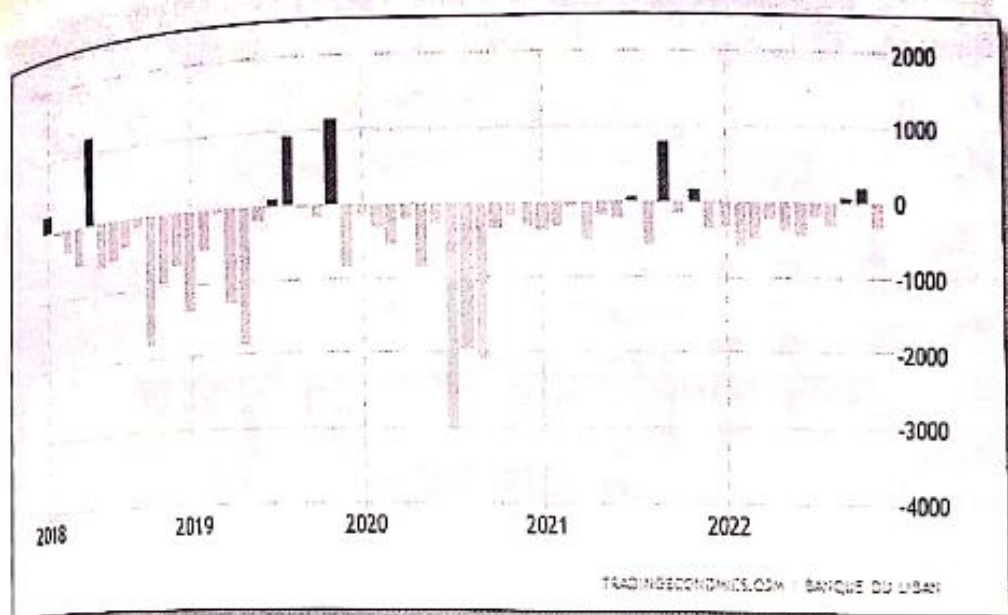
চিত্র : লেবাননের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, মিলিয়ন ডলারে (সূত্র : ট্রেডিং ইকোনমিকস)
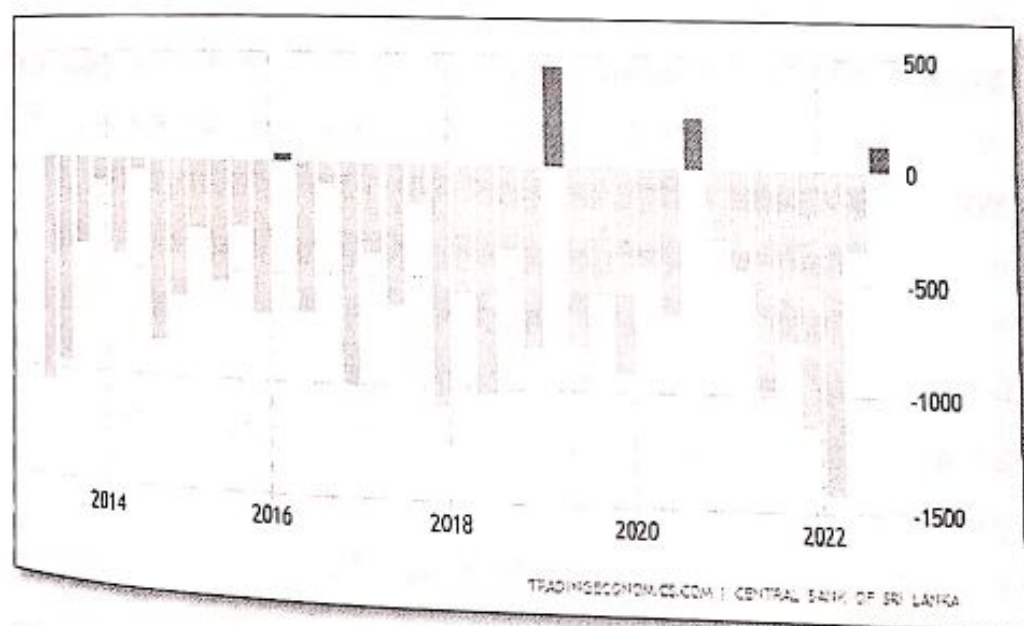
চিত্র : শ্রীলঙ্কার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, মিলিয়ন ডলারে (সূত্র : ট্রেডিং ইকোনমিকস)

investment)। তবে ওপরের গল্পের সাথে বর্তমান বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে বর্তমানে সব দেশের অভ্যন্তরে এক রকম মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না। একেক দেশের অভ্যন্তরে একেক রকম মুদ্রা চালু আছে। তাই এক দেশের মুদ্রা আরেক দেশে চলে না। যেমন সুইজারল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক বাংলাদেশে চলে না। আবার বাংলা টাকা সুইজারল্যান্ডে চলে না। তার মানে এক দেশের টাকা আরেক দেশে চলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং প্রত্যেক দেশের টাকা নিজ নিজ দেশেই নিশ্চিতরূপে থাকবে। সে ক্ষেত্রে ওপরের আলোচনা কি প্রাসঙ্গিক?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আবারও সুখ সাগর এবং শান্তি নগরে নজর দিই। এবারে মনে করি, সুখ সাগরের মুদ্রায় রাজা প্রশান্তের এবং শান্তি নগরের মুদ্রায় রানি শান্তনার স্বাক্ষর করা আছে। এক দেশের মুদ্রা আরেক দেশে চলে না।

এখন হিসাবটা অনেক জটিল হয়ে গেছে। যেহেতু দুটি ভিন্ন দেশের মধ্যে সাধারণ মুদ্রা নেই, আগের মতো সহজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি মধ্যস্বত্বতাকারী প্রতিষ্ঠান। আনন্দ নামে একজন ব্যাংকার দুই দেশের সাথেই ভালো সম্পর্ক রাখে এবং উভয় দেশের ব্যাংকিং সেক্টরেই তার দৃঢ় উপস্থিতি রয়েছে। সে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আপনাদের সমস্যা নিরসনে আমি মাধ্যম হিসেবে কাজ করি। আপনাদের দেনা-পাওনা আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমি দেখছি।'

এভাবে শান্তি নগরের কোনো ব্যক্তি সুখ সাগরের কোনো ব্যবসায়ীর থেকে পণ্য কিনতে চাইলে আনন্দের ভায়া হয়েই লেনদেন করে। প্রথমে যেহেতু দুই পাশে মুদ্রার লেনদেন গড়পড়তা সমান ছিল, সব মিলিয়ে আনন্দের ব্যাংকে উভয়ের মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের একটা ভারসাম্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর ইঞ্জিনচালিত যান তৈরি হয়ে গেল। তখন আনন্দের ব্যাংকে প্রশান্তের মুদ্রার পাহাড় জমা হলো কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্রেতা খুঁজে পাওয়া গেল না, ওদিকে শান্তনার মুদ্রার চাহিদা গগনচুম্বী কিন্তু কোনো বিক্রেতা পাওয়া গেল না। বিক্রেতা আছে কিন্তু ক্রেতা নেই, সরবরাহ আছে কিন্তু চাহিদা নেই, এমন পরিস্থিতিতে ইতিহাসে সব সময় যা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তা-ই হবে। প্রশান্তের মুদ্রার দাম পড়ে যাবে।

এমনি করেই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করে থাকে। কোনো একটি দেশের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হলে সেই দেশকে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (রিজার্ভ) থেকে খরচ করতে হয়। সঞ্চয় শেষ

হয়ে গেলে ঋণ নিতে হয় অথবা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের কাছে সম্পদ বিক্রয় করে দিতে হয়।

তবে কোনো রাষ্ট্রে যদি বিদেশি বিনিয়োগ না আসে এবং সেই রাষ্ট্রের জনগণ বিদেশি ঋণ না নেয়, সে ক্ষেত্রে দেশটির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। কোনো কিছুতেই কাজে না দিলে মুদ্রার দরপতন ঠেকানোর মতো কিছুই থাকে না। একপর্যায়ে ঋণ বিফল হয় এবং দেউলিয়া হয়ে অর্থনীতিতে ধস নামে।[২০] তখন মুদ্রার মান খুব দ্রুত পড়ে যায় এবং বেকারত্ব তীব্র আকার ধারণ করে।

২০ সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা ও লেবাননে তা-ই হয়েছে।

মুদ্রার দর পরিবর্তনের প্রভাব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর মুদ্রার দর পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নেই। মুদ্রা হচ্ছে তরল বস্তুর মতো। যখন যে পাত্রে রাখা হয়, তখন সেই পাত্রের আকৃতি ধারণ করে। অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা, যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি কিংবা মানবসম্পদের সাথে এর কোনো যোগসূত্র নেই। একটি দেশের মুদ্রার মান বাড়লে বা কমলে একটি জাতির সক্ষমতা যা থাকার তা-ই থাকবে। কেউ কিছু হারাবে বা পাবে না। টাকা ছাপিয়ে যেমন একটি জাতিকে ধনী করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি টাকার মান কমিয়ে কোনো জাতিকে বাণিজ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভব নয়। কারণ, টাকা নিজে কোনো সম্পদ নয়। তবে স্বল্প মেয়াদে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। পূর্বের বইতে আমি এমনই একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেছি, যা আপনাদের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো।

জলিল সাহেব প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি করেন। একবার জলিল সাহেব আমেরিকাতে ১ কোটি ডলারের সমমূল্যের পণ্য রপ্তানির অর্ডার পেলেন। চুক্তি মোতাবেক তিনি তিন মাস সময় নিয়ে সবকিছুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। তারপর তিনি মালপত্র গুছিয়ে জাহাজে তুলে আমেরিকাতে প্রেরণ করে দিলেন। তিনি যখন জাহাজে মাল তুললেন, তখন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ছিল ৮৫ টাকা। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নোঙর ফেলতে ফেলতে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য হয়ে গেল ৯০ টাকা।

যা-ই হোক, হাতে মাল বুঝে পেয়ে আমেরিকান ক্রেতা জলিল সাহেবের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ডলার পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এই ডলার ভাঙিয়ে ৯০ কোটি টাকার ক্যাশে রূপান্তর করে খুশিতে ঝাঁপ দিলেন। কারণ, তার পাওয়ার কথা ছিল ৮৫ টাকা। সেই মূল্যেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি পেয়ে গেলেন ৯০ টাকা। মাল যেহেতু আগেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, এই টাকার সাথে বাড়তি খরচেরও কোনো সম্পর্ক নেই। তাই কোনো পরিশ্রম

না করে এবং কোনো ঝুঁকি বহন না করে তিনি ৫ কোটি টাকা আয় করলেন। কী সুন্দর সাফল্য!

ওপরের উদাহরণ পড়ে আপনাদের মনে হতে পারে একটি দেশও এভাবে টাকার মান কমিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভবান হতে পারে। সত্যি কথা বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা ছাপিয়ে মুদ্রার দরপতন করালে স্বল্প মেয়াদে কিছুটা লাভবান হওয়া সম্ভব। তবে দীর্ঘ মেয়াদে শ্রমিকদের বেতন, পরিবহন খরচ, বিদ্যুৎ খরচ ও অফিসভাড়া সমান তালে বেড়ে যে লাউ সেই কদুই হয়ে যাবে। এই পলিসি দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদে বিশেষ কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না। ধরুন, আমেরিকা থেকে কেউ বাংলাদেশের একটি তৈরি পোশাক আগে ১ ডলার মূল্যে কিনত। তখন প্রতি ডলারে বাংলাদেশের টাকার মান ছিল ৫০ টাকা। কিছু বছর পরে ডলারের মূল্যস্ফীতি না হলেও টাকার মান কমে এক ডলারের বিপরীতে ৬০ টাকা হয়ে গেল। এই টাকার মান কমার সাথে সাথে সবকিছুর দাম বেড়ে যাবে। তাই আমেরিকানদের আগে এক ডলারে যা কিনতে হয়েছিল, তা এখনো এক ডলারেই কিনতে হবে।

এবার আসা যাক আমদানির কথায়। ধরি, আমেরিকা থেকে একটি ল্যাপটপ আমদানি করতে ১,০০০ ডলার লাগে। প্রতি মার্কিন ডলারের মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০০ টাকার সমান। এখন যদি টাকার মান পড়ে যায় এবং ১ ডলার = ১২০ টাকা হয়ে যায়, বাংলাদেশিদের জন্য কি ল্যাপটপ আমদানি করা কঠিন হয়ে পড়বে?

উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বল্প মেয়াদে ভালোই কঠিন হবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশিদের জন্য ল্যাপটপ কেনা কঠিন হবে না। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে দীর্ঘ মেয়াদে সবকিছুর দাম বেড়ে যাবে। আগে যেখানে একজন শ্রমিক এক ঘণ্টা কাজ করে ৩০০ টাকা পেত, এখন সেখানে পাবে ৩৬০ টাকা। ঠিক একইভাবে আগে যেখানে একজন কর্মজীবী এক মাসে ২৫ হাজার টাকা বেতন পেত, এখন সেখানে সে পাবে ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ আগেও দুই মাসের আয় দিয়ে সে একটি ল্যাপটপ কিনতে পারত, এখনো দুই মাসের আয় দিয়ে সে একটি ল্যাপটপ কিনতে পারবে।

তবে ভাই, একটা ব্যাপার স্বীকার করে যেতে চাই। সেটা হলো, বাংলাদেশের বেসরকারি শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের বেতন মূল্যস্ফীতি ও অন্য ব্যাপারগুলোর প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়। অর্থাৎ এগুলো বছর বছর অ্যাডজাস্ট করা হয় না। বছরের পর বছর মানুষ আগের বেতনেই কাজ করে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতির ফলে যতই লাফ দিক বাজারের জিনিসপত্রের দামের, বাংলাদেশের মানুষ সাহস করে বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবি তোলে না।

মানুষজন খুবই ভালো, তারা এই সব দাবি করাকে অশোভন মনে করে। বড়জোর নতুন চাকরিতে যাওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ সবার জন্য নিজের অধিকার বুঝে নেওয়াটা সহজ করে দিন।

এবার আসা যাক চরম একটি উদাহরণে। মনে করি, জিম্বাবুয়ে বা ভেনেজুয়েলাতে টাকার মান কমে একেবারে কাগজ হয়ে গেল। এক সের চালের দাম হয়ে গেল এক কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে কি বাণিজ্য প্রভাবিত হবে? এক্ষেত্রেও দীর্ঘ মেয়াদে বাণিজ্য প্রভাবিত হবে না। কারণ, যে দেশে চালের সের এক কোটি টাকা, সেই দেশে এক দিনের কাজের পারিশ্রমিক দশ কোটি টাকা কিংবা এক মাসের বেতন ৩০০ কোটি টাকা হবে। তা না হলে কেউ কারও কাজ করবে না। কীভাবে নিশ্চিত হবেন? এমন একটি দেশে যদি এক ঘণ্টা কাজ করিয়ে কোনো গৃহস্থ তার শ্রমিককে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দেয়, কোনো শ্রমিক তার কাজ করবে না। কারণ, এভাবে সারা দিন কাজ করেও সপরিবারে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্যের কাজ না করে শ্রমিকেরা নিজের ফসল নিজে ফলাতে চাইবে। কারও নিজের জমি না থাকলে বর্গা নেবে কিংবা অন্যান্য ব্যবসা করবে ইত্যাদি।

এবার আলোচনা করি একজন গৃহস্থ কিংবা ক্ষুদে ব্যবসায়ী কীভাবে কোটি কোটি টাকা পাবে? মনে করেন, একজন কৃষক এক মণ চাল বিক্রি করছেন ৪০ কোটি টাকায় (সের এক কোটি টাকা)। তিনি চাইলেই এক ঘণ্টা কাজ করিয়ে একজন শ্রমিককে এক সের চাল বা এক কোটি টাকা দিতে পারেন। এটা কোনো ব্যাপার নয়। একজন শ্রমিকও এক কোটি টাকা দিয়ে চুল কাটাতে পারে। কিংবা ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে এক কাপ চা খেতে পারে। অনেকে মনে মনে ভাবতে পারেন, সমাজে এত টাকা না-ও থাকতে পারে। ধরা যাক, জিনিস পত্রের দাম বেশি কিন্তু কারও হাতে টাকা নেই, এমন অবস্থায় কী হবে? নিয়ম হচ্ছে সবার হাতে টাকা থাকলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং কারও হাতে টাকা না থাকলে জিনিসপত্রের দাম কম থাকবে। তারপরও তর্কের খাতিরে ধরে নিই, এমন একটি সমাজে এমন অবস্থা বিরাজমান যে সবকিছুর দাম বেশি কিন্তু কারও হাতে টাকা নেই। তখন কী হবে?

উত্তর খুব সহজ, বিনিময় প্রথা। মনে করেন, আপনি তিন ঘণ্টা খেতে কাজ করে তিন সের চাল পেলেন। এখন আধা সের চাল দিয়ে দোকান থেকে এক কাপ কফি খেলেন এবং বাকি আধা সের চালের বিনিময়ে দুটি ডিম কিনলেন। আরও এক সের চাল দিয়ে কিছু ডাল, আলু ও দুটি কাঁচা মরিচ

কিনলেন। তারপর বাসায় এসে সপরিবারে গরম ভাত রান্না করে খেলেন। কোটি কোটি টাকার দরকার আছে?

ঠিক এভাবেই সমাজের প্রতিটি কাজ চলবে। এককথায় প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের সংখ্যা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বস্তুগত ব্যবসা-সম্পদ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যদি আগের মতোই থাকে, জীবন অপরিবর্তিত থাকবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বা মানুষের জীবনযাত্রার মানে দীর্ঘ মেয়াদে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসবে না। সবকিছু আগের মতোই থাকবে। তবে যারা অনেক টাকা ক্যাশ করে রেখেছিলেন, তাদের সমস্যা হয়ে যাবে।

দীর্ঘ মেয়াদে মুদ্রার দরপতন বা উত্থানের প্রভাব শূন্য হলেও স্বল্প মেয়াদে মুদ্রার দরপতনে বড় পার্থক্য দেখা যায়। কারণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে অর্থনীতির বেশ সময় লাগে। বাস্তবে কোনো অর্থনীতি ১০০ ভাগ কার্যকর না। সেজন্য ক্রমাগত টাকার মান কমাতে থাকলে রপ্তানি খাতে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাণিজ্য ঘাটতির ফলে মুদ্রার মান কমলে সরকারের হাতেও বাড়তি টাকা আসে না। সব মিলিয়ে মুদ্রার দরপতনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে না, এই কথাটি বলার মানে এই নয় যে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ক্রাইসিসের ফলে মুদ্রার দরপতন ক্ষতিকর কিছু নয়। মুদ্রার দরপতন মানুষের সঞ্চয়ের মান কমিয়ে দেয়। এতে টাকা সঞ্চয়কারী প্রতিটি ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই দরপতন মুদ্রা ছাপানোর সাথে সম্পর্কিত নয়। ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের সাথে সম্পর্কিত। যদি টাকা ছাপিয়ে মূল্যস্ফীতি করানো হয়, যেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টাকা ছাপিয়েছিল, তারা লাভবান হয় এবং বাকি সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে একই দেশের ভেতরে কেউ পায়, কেউ হারায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংক্রান্ত মুদ্রার দরপতন সবার জন্যই ক্ষতিকর। এতে করে একটি দেশের ভেতরে টাকা সঞ্চয়কারী প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সঞ্চিত অর্থের মূল্যমান হারায়, যা অর্থনীতির জন্য একটি অশনি সংকেত হিসেবে কাজ করে। আর যদি এমন একটি দেশের বৈদেশিক ঋণ থাকে, তাহলে তা অর্থনৈতিক প্রলয় ডেকে আনে।

টীকা – চীনের কারেন্সি যুদ্ধ

চীন কি সত্যিই কারেন্সি যুদ্ধ করে আমেরিকার তুলনায় এগিয়েছে, যেমনটা আমেরিকা দাবি করে আসছে? নাকি তারা তাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন, ব্যবসা উদ্যোগ এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্যতম বাণিজ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে? এর উত্তরে আমি বলব দ্বিতীয়টি কারণ কেবল কারেন্সি যুদ্ধ করে যদি কিছু করা যেত, চীনের মতো অন্যান্য দেশও তা করতে পারত। টাকা ছাপানো কঠিন কিছু নয়। ছাপাখানাতে ছাপালে কিংবা কি-বোর্ডে বড় একটি সংখ্যা টাইপ করে দিলেই টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাহলে চীন যা পারল, তা অন্য কেউ পারল না কেন?

সত্যি কথা বলতে আমেরিকা চীনের তুলনায় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই দায়বদ্ধতা এড়াতে তারা একটি অজুহাত দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে চীনের উন্নয়ন এমনি এমনি আসেনি। প্রথমত, চীনের সরকার অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশদূষণ, শ্রম অধিকার ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি চীনের জনগণও উন্নয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। ছোটবেলা থেকেই চীনা ছেলেরা স্বপ্ন দেখে কীভাবে অধিক সম্পদশালী হওয়া যায়, বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায় ইত্যাদি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও স্বপ্ন দেখে কীভাবে অধিক ধনী হওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, জাতি হিসেবে চীনারা অত্যন্ত মেধাবী। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে চীনারা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবেও চীন উন্নয়নের শীর্ষে থাকা একটি রাষ্ট্র।

তৃতীয়ত, চীনের জনগণ কঠোর পরিশ্রমী। পৃথিবীর অন্যতম পরিশ্রমী জাতি হিসেবে চীনের খ্যাতি আছে।

সবশেষে চীনাদের মধ্যে আন্দোলনের প্রবণতাও কম। রাজনৈতিকভাবে চীন অত্যন্ত স্থিতিশীল।

সেই তুলনায় আমেরিকা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। সেখানে রাজনৈতিক ঝামেলা, দলাদলি, আইনকানুনের ঝামেলা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, হত্যা, ধর্ষণ ও মাদকাসক্তির প্রবণতা অনেক বেশি। আমার মতে, এ-জাতীয় কারণেই চীন আমেরিকার তুলনায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ডলারের চক্র

কিসিমো একজন জাপানি ব্যক্তি। সে আমেরিকাতে টয়োটা গাড়ি বিক্রি করে ডলার অর্জন করল। যেহেতু জাপানে ডলার চলে না, কিসিমোকে ডলার দিয়ে আমেরিকা থেকে পণ্য বা সেবা কিনতে হবে। এভাবে তার অর্জিত ডলার আমেরিকাতেই ফেরত যাবে।

কিন্তু মনে করেন, কিসিমো এই ডলার দিয়ে কিছু না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাতে কি সমীকরণ বদলাবে? না, কিসিমো যদি শেয়ারবাজার থেকে শেয়ার কিনতে চায়, তাকে আমেরিকা থেকেই কিনতে হবে। কারণ, জাপান বা ব্রিটেনের শেয়ারবাজার থেকে ডলারে শেয়ার কেনা সম্ভব নয়। কিসিমো যদি বাড়ি বা জমি কিনতে চায়, তা-ও আমেরিকা থেকেই কিনতে হবে। কারণ, আমেরিকার বাইরে সাধারণত মার্কিন ডলার চলে না। এভাবে তার হাতের ডলার আমেরিকাতেই বিনিয়োগ হয়ে ফেরত আসবে।

এবার মনে করি, কিসিমো সিদ্ধান্ত নিল সে ডলারকে ইয়েনে রূপান্তর করে জাপান থেকে শেয়ার কিনবে। তাতেও সমীকরণের ফলাফল বদলাবে না। কারণ, যে ব্যক্তির কাছে কিসিমো ডলার বিক্রি করবে, তাকেও ডলার দিয়ে আমেরিকা থেকেই জিনিস কিনতে হবে।

এবার ধরা যাক, কিসিমো সঞ্চয়পত্র কিনল বা ব্যাংকে টাকা রাখল। তাতেও আমেরিকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে ডলার দেওয়া হবে। সবশেষে ধরা যাক কিসিমো ডলার দিয়ে কিছু না করে তোশকের নিচে রেখে দিল। এর দ্বারা আমেরিকাতে ডলার ফেরত যাবে না। কিন্তু আমেরিকার মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি পাবে। কারণ, সে তার টাকা আমেরিকান মুদ্রাতে রেখেছে এবং এর দ্বারা ডলারে একটা ভ্যালু যুক্ত হয়েছে।

একই ঘটনা একজন আমেরিকানের জন্যও সত্য। কোনো আমেরিকান যদি জাপানে সফটওয়্যার বিক্রি করে ইয়েন অর্জন করে, যেহেতু আমেরিকাতে

ইয়েন চলে না, সে নিশ্চয়ই তা খাটের নিচে রেখে দেবে না। সে নিজে জাপান থেকে পণ্য বা সেবা কিনবে অথবা এই টাকা জাপানে বিনিয়োগ করবে। সে যদি মানি এক্সচেঞ্জে ইয়েন বিক্রি করে ডলার কেনে এবং যিনি ইয়েন কিনেছেন, তিনি এই টাকা আবার জাপানে বিনিয়োগ করবেন। সব মিলিয়ে জাপান থেকে যে টাকা বের হয়েছে, তা জাপানেই বিনিয়োগ বা ঋণ হয়ে ফেরত আসবে।

যেহেতু দুটি ভিন্ন দেশ নিজেদের মাঝে ডলারে আন্তর্জাতিক লেনদেন করে, সবাই চায় নিজেদের হাতে ডলার সংগ্রহ করে রাখতে। অর্থাৎ যে সকল দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রা ডলার নয়, তারাও চায় ডলার সংগ্রহ করতে। এ কারণেই জাপানে, সুইজারল্যান্ডে, ভারত, ঘানা কিংবা চীন—সবাই ডলার অর্জন করে বিপদের দিনের জন্য তা সঞ্চয় করতে রাখতে চায়। তবে এমনটা ভাবা অনুচিত যে প্রত্যেক দেশ নিজেদের সিন্দুকের ভেতরে বা তোশকের নিচে ডলার সঞ্চয় করে রাখে। সমস্ত ডলার আমেরিকাতেই ফেরত আসে। সাধারণত এগুলো দিয়ে মার্কিন সরকারের সঞ্চয়পত্র কেনা হয় বা আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। এজন্য মার্কিন সরকার কম সুদের হারে ঋণ নিতে পারে এবং আমেরিকার ব্যাংকগুলো গ্লোবাল ফাইন্যান্সের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সঞ্চিত ডলার অনেকেই আমেরিকাতে বিনিয়োগ করে। এর ফলে আমেরিকা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কারণে আমেরিকার শেয়ারবাজার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সম্পদের মালিকেরা লাভবান হয়ে থাকে।

> *'This unique ability of the US Government to borrow from foreign central banks rather than from its own citizens is one of the economic miracles of modern times. Without it the war-induced American prosperity of the 1960s and early 1970s would have ended quickly...'*
>
> — Michael Hudson

> *আমেরিকার সরকার নিজের দেশের নাগরিকদের থেকে ঋণ না দিয়ে বিদেশি ব্যাংকগুলোর থেকে ডলারে ঋণ নিতে পারে। এই বিষয়টি বর্তমান সময়ের অন্যতম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম দিয়েছে। এমনটা না করতে পারলে (আমেরিকার) ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দিকের যুদ্ধকেন্দ্রিক উন্নয়ন দ্রুতই গায়েব হয়ে যেত...*
>
> —মাইকেল হাডসন, অর্থনীতিবিদ ও লেখক

ডলার সরবরাহ

If a currency is to become a growing, an increasing reserve currency, there has to be not only a demand for it there has to be a supply of it.

\- Robert C. Solomon

Philosopher, not able author, and "Distinguished Teaching Professor of Business and Philosophy" at the University of Texas at Austin

যদি একটি মুদ্রাকে দ্রুত বর্ধনশীল রিজার্ভ মুদ্রা হতে হয়, তার জন্য কেবল চাহিদা নয়, মুদ্রার সরবরাহ থাকাও জরুরি।

–রবার্ট সি সলোমন

দার্শনিক, বিশিষ্ট লেখক ও ব্যবসা দর্শন অধ্যক্ষ– টেক্সাস অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়

ফেডারেল রিজার্ভ ছাড়া আর কেউ ডলার ছাপাতে পারে না। কিন্তু ডলারের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সব দেশেরই আছে। তাহলে ফেডারেল রিজার্ভের কুঠুরি থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার প্রবেশ করবে কীভাবে? ডলার ছাপিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ নিশ্চয়ই আমেরিকান ভোক্তাদের ঘরে ঘরে পণ্য সরবরাহ করে না কিংবা ভ্রমণপিপাসু নাগরিকদের ভ্রমণ খরচ দেয় না। তাহলে ডলার কীভাবে সবার হাতে হাতে প্রবেশ করে?

লক্ষ্য করুন, ডলার ছাপিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ সাধারণত সঞ্চয়পত্র কেনে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। গ্রাহকেরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ করে। সরকারও ফেডারেল রিজার্ভ থেকে ঋণ নিয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। এভাবে আমেরিকার জনগণ ও সরকারের হাত থেকে সুদমুক্ত উপায়ে অন্যান্য দেশে ডলার ছড়িয়ে পড়ে। সমস্যা হচ্ছে, বিদেশিরা যখন আমেরিকা থেকে পণ্য ও সেবা কেনে, তখন ডলার আবার আমেরিকাতে ফেরত আসে। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি বজায় থাকলে আমেরিকা থেকে সারা বিশ্বে ডলার প্রবাহিত হতে থাকে এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্তি থাকলে সারা বিশ্ব থেকে আমেরিকার দিকে ডলার প্রবাহিত হতে থাকে। তার মানে সারা

দুনিয়াতে ডলারের সরবরাহ বজায় রাখতে হলে আমেরিকাকে বাণিজ্য ঘাটতি বজায় রাখতে হবে।

টীকা : স্বর্ণের ডিমপাড়া রাজহাঁস

সাধারণত একটি রাষ্ট্র দীর্ঘদিন বাণিজ্য ঘাটতি বজায় রাখতে পারে না। তবে আমেরিকা এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ডলার ছাপিয়ে আমদানি করা আমেরিকার জন্য কোনো সমস্যা নয়। সে নিজের ইচ্ছেমতো ডলার ছাপিয়ে বিদেশ থেকে পণ্য ও সেবা কিনতে পারে।

ছোট থাকতে আপনারা নিশ্চয়ই স্বর্ণের ডিমপাড়া রাজহাঁসের গল্প শুনেছেন। গল্পতে একজন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণের ডিমপাড়া রাজহাঁস ছিল। সেই ব্যক্তি সোনার ডিম বাজারে বিক্রি করত এবং মহা আনন্দে জীবন যাপন করত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডলার হচ্ছে সেই সোনার ডিম এবং একমাত্র আমেরিকার কাছে সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁস আছে। পৃথিবীতে আর কারও কাছে এমন রাজহাঁস নেই। এজন্য প্রতিটি রাষ্ট্র রপ্তানি বেশি এবং আমদানি কম করার চেষ্টা করবে। যেন তাদের হাতে স্বর্ণের ডিম থাকে। সমস্যা হচ্ছে এই খেলাতে কিছু সদস্যকে হারতে হবেই। সবাই জিতবে বা আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হবে, এমনটা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, যে উপায়ে মানুষের হাতে হাতে ডলার প্রবেশ করে তা হচ্ছে বিনিয়োগ। আমেরিকার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডলারে বিনিয়োগ করে, তখন আমেরিকা থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ডলার ছড়িয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যখন আমেরিকাতে বিনিয়োগ আসে, তখন ডলার আবার আমেরিকাতে ফেরত আসে। তাই সারা বিশ্বে ডলার ছড়িয়ে দিতে আমেরিকাকে সর্বদা বিনিয়োগ-ঘাটতি বজায় রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, রেমিট্যান্স, ভ্রমণ, অনুদান ইত্যাদি দ্বারাও আমেরিকা থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ডলার স্থানান্তরিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও কেউ আমেরিকাতে ভ্রমণ করলে বা বিদেশে কর্মরত আমেরিকান নিজ দেশে রেমিট্যান্স পাঠালে ডলার আবার ফেরত আসে। সব মিলিয়ে এক্ষেত্রেও আমেরিকাকে ঘাটতি বজায় রাখতে হবে।

সবশেষে যে উপায়ে ডলার সারা বিশ্বে ছড়াতে পারে, তা হচ্ছে ঋণ। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, প্রাইভেট ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক কিংবা আইএমএফ

ঋণের মাধ্যমে ডলার সারা বিশ্বে ছড়াতে পারে। এই ঋণগুলো ধরনে ও প্রকারে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

১। উন্নত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে ফেডারেল রিজার্ভ কারেন্সি সোয়াপ করে। এভাবে ঋণ আকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডলার সরবরাহ হয়।

২। বিশ্বব্যাংক থেকে দরিদ্র দেশগুলোর সরকার ঋণ এবং অনুদান পেয়ে থাকে। এভাবে দরিদ্রতম দেশগুলোর হাতে ডলার সরবরাহ করা হয়।

৩। আইএমএফ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেওয়া হয়; বিশেষ করে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংকটে পড়া রাষ্ট্রগুলোকে আইএমএফ ঋণ দিয়ে থাকে।

৪। সবশেষে আমেরিকার বেসরকারি ব্যাংকগুলো ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঋণ প্রদান করে।[২১]

এভাবে ঋণের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ডলার সরবরাহ বজায় থাকে। কিন্তু এই ঋণ কি সুদে-আসলে পূরণ করা সম্ভব হবে? সেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে জেনে নিই কারেন্সি সোয়াপ কী?

টীকা : কারেন্সি সোয়াপ

কারেন্সি সোয়াপ কী, তা সুন্দর করে বোঝাতে আমরা এখন মোহাম্মদ মিরাজ মিয়ার একটি লেখা পড়ব।

কারেন্সি সোয়াপ হচ্ছে দুটি পক্ষের মধ্যে দুই ধরনের মুদ্রায় অর্থ লেনদেনের একটা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে ভবিষ্যতে মুদ্রার বিনিময় হার ওঠানামা করলেও উভয় পক্ষেরই তেমন ঝুঁকি থাকে না এবং সহজে ঋণ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মনে করি, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করল একে অপরের কাছ থেকে মুদ্রা বিনিময় করবে অথবা লোন নেবে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার নিয়েছে, আর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছে ১০০ কোটি টাকা। তাহলে এখানে মুদ্রার Exchange Rate হয়েছে 1 Dollar = 100 Taka. অর্থাৎ বাংলাদেশ এক ডলারের বিপরীতে একশো টাকা করে দিয়েছে। এখন ভবিষ্যতে গিয়ে যদি এমন হয় যে টাকার ভ্যালু কমে

---

২১ আমরা ইতিমধ্যেই জানি, একটি দেশের মুদ্রাব্যবস্থা মূলত বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

গিয়েছে কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন 1 Dollar = 120 taka, এতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার যদি এমন হয় যে ডলারের মূল্য কমে গিয়েছে কিন্তু টাকার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন 1 Dollar = 80 Taka হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্রকে টাকা ক্রয় করতে বেশি ডলার খরচ করতে হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই উভয় পক্ষ আগে থেকেই বা চুক্তির সময় 1 Dollar = 100 Taka হিসেবে একে অপরের কাছ থেকে ডলার বা টাকা নিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে Exchange Rate ওঠানামা করলেও তাদের কোনো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে না।

বর্তমানে কারেন্সি সোয়াপ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে। বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুটো কোম্পানি যদি এভাবে কারেন্সি সোয়াপ করে, তাহলে তারা সহজে লোন নিতে পারবে। কাউকে ডলার বা টাকা ক্রয় করতে ফরেন কোনো ব্যাংকের কাছে যেতে হবে না।

কারেন্সি সোয়াপের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কাকে ঋণসহায়তা

উন্নয়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণ, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, রাজনৈতিক অরাজকতা ইত্যাদি নানা কারণে নাজুক হয়ে পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় রিজার্ভশূন্য হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক ঋণের ভারসাম্যহীনতার কারণে ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ঘাটতি থেকে শ্রীলঙ্কা বের হতে পারছিল না। এ অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে প্রথমবারের মতো ঋণ দিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় বাংলাদেশ। ২০২২ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৪১৪তম সভায় শ্রীলঙ্কাকে ঋণসহায়তা হিসেবে ২০ কোটি ডলার ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কাকে এই ঋণ দেওয়া হবে সোয়াপ পদ্ধতিতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই কম। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে মাত্র ৪৬৩ কোটি টাকার পণ্য। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে মাত্র ৩২৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তা জানান, শ্রীলঙ্কা থেকে ৫০ কোটি ডলার সোয়াপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশটির সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বিবেচনায় আপাতত ২০ কোটি ডলার সোয়াপ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কারেন্সি সোয়াপের প্রথম ঘটনা। তবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের নাজুক পরিস্থিতি কাটাতে অনেক আগে থেকে ভারতের সঙ্গে কারেন্সি সোয়াপ করে আসছে শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বেশি কারেন্সি সোয়াপ রয়েছে চীনের সঙ্গে।

কারেন্সি সোয়াপের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা যেভাবে পরিশোধ করবে এই ঋণ:

বাংলাদেশ থেকে এই ২০ কোটি ডলার ধারের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে লাইবরের (লন্ডন আন্তব্যাংক সুদের হার) সঙ্গে অতিরিক্ত ২ শতাংশ সুদ যুক্ত

করে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করবে। তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য দিতে হবে লাইবরের সঙ্গে অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ সুদ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি দেবে শ্রীলঙ্কার সরকার ও দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাশাপাশি ২০ কোটি ডলার সমমূল্যের শ্রীলঙ্কান রুপি দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে লিয়েন হিসেবে জমা থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করবে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কা। এ বিনিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদ হিসেবে বাড়তি আয় করতে পারবে। বিষয়টি আরেকটু সহজ করে বলি। সাধারণত দুটি দেশের মধ্যে সংগঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন হয় ডলারে। কিন্তু একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যদি ডলারের রিজার্ভ যথেষ্ট না থাকে, তাহলে দেশটি বৈদেশিক লেনদেন করতে অক্ষম হয়ে যায়। তখন সে তার নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য করে। যেমন শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ থেকে যে ২০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে, সে ঋণ শ্রীলঙ্কা যখন বাংলাদেশকে পরিশোধ করবে, তখন ডলারে পরিশোধ করবে না। কারণ, শ্রীলঙ্কা ইতিমধ্যে ডলার সংকটে রয়েছে। তাই বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধে শ্রীলঙ্কা যে কাজটা করবে, সেটা হলো ঋণ নেওয়া ২০ কোটি ডলার সমপরিমাণ শ্রীলঙ্কান নিজস্ব মুদ্রা (রুপি) তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখবে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখা সেই রুপি দিয়ে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা থেকে যেকোনো পণ্য ক্রয় করলে সেটা দিয়ে পেমেন্ট সম্পন্ন করবে। শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশ আমদানি করলে সেই আমদানির টাকা শ্রীলঙ্কা তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা রুপি থেকে কেটে নেবে। এটাই হচ্ছে কারেন্সি সোয়াপ।

–মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া

লেখক: দ্য কসমিক প্লে অব কনটেম্পোরারি গ্লোবাল পলিটিকস

বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি

বৈদেশিক ঋণে বাড়তি ঝুঁকিসমূহের একটি হচ্ছে মুদ্রার দরপতন। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে ১০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে। এই ঋণ যখন নেওয়া হয়েছিল, তখন এক ডলারের বিপরীতে টাকার দাম ছিল ৮০। অর্থাৎ দেশীয় টাকায় বাংলাদেশ সরকার ৮০,০০০ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছে। কিন্তু ঋণ নেওয়ার কিছুদিন পরই বাংলাদেশ ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ক্রাইসিসে পড়ল। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার জোগান না থাকায় কিছুদিনের মধ্যে এক ডলার সমান ১২০ টাকা হয়ে গেল। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের ঋণ ও সুদের বোঝা রাতারাতি ৫০% বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সরকার কর্তৃক ঋণের ও সুদের দায় পূরণ করা খুব কঠিন হয়ে গেছে (অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থায় সরকার দেউলিয়া পর্যন্ত হয়ে যায়)। এজন্যই বৈদেশিক মুদ্রাতে ঋণ নিলে ডলার রেট, ব্যালেন্স অব পেমেন্টস, রিজার্ভ, রপ্তানি, রেমিট্যান্স ইত্যাদির ওপর কড়া নজর রাখতে হয়।

বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার অপর সমস্যা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনেটারি পলিসি দ্বারা সরকারকে সহায়তা করতে পারে না। তাই সরকার যদি ডলারশূন্য হয়ে বিপদে পড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে উদ্ধার করতে পারে না। মনে করেন, ২০০৯ সালে সরকার ১০ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। তখন দেশের রিজার্ভ ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্তি ছিল ১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রিজার্ভ কমে ৬ বিলিয়ন ডলার হয়ে গেল এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্তি উবে গেল। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে উদ্ধার করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি টাকা ছাপিয়ে ডলার কিনে সরকারকে উদ্ধার করতে চায়, দেশে চরম মূল্যস্ফীতি দেখা দেবে বা দেশীয় টাকার মান পড়ে যাবে। এর ফলে ঋণের বোঝা বড় হয়ে যাবে এবং জনগণের সঞ্চয়ের মান কমে যাবে।

বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, যে দেশের মুদ্রাতে ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেই দেশের মনেটারি পলিসি সরকারের ওপর প্রভাব ফেলে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাজার থেকে ডলার তুলে ফেলা শুরু করে এবং ঋণে সুদের হার বেড়ে যায়, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন সরকারকে সহায়তা করতে পারবে না। ধরা যাক, ফেডারেল রিজার্ভ ডলারে সুদের হার বাড়িয়ে ২% থেকে ১২% করে ফেলল। এর ফলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যে যত ডলার ঋণ নিয়েছিল, তার সুদের হার ২% + রিস্ক প্রিমিয়াম থেকে বেড়ে ১২% + রিস্ক প্রিমিয়াম হয়ে যাবে।[২২]

সবশেষে কোনো দেশের সরকারের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা বা ক্রেডিট রেটিং যদি কমে যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত নিজ টাকায় সরকারি সঞ্চয়পত্র কিনে সুদের হার দাবিয়ে রাখে। তবে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে এমনটা করা সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক লেনদেন, মুদ্রার দরপতন এবং দেউলিয়াত্ব একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

২২ ফিক্সড রেটের ক্ষেত্রে ঋণ নবায়নের সময় এবং ফ্লোটিং রেটের ক্ষেত্রে প্রায় সাথে সাথেই সুদের হার পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ফেডারেল রিজার্ভ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে

জুয়ার টেবিলে আপনি যদি টাকার একমাত্র সোর্স হন, খেলার মাঠ নিয়ন্ত্রণ করবেন আপনি। টেবিলের সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে এবং আপনার কাছ থেকে বারবার ঋণ নিতে আসবে। এক্ষেত্রে আপনি যদি চান খেলা চলতে থাকুক, তাহলে আপনার জন্য উচিত হবে টাকার সরবরাহ বজায় রাখা এবং আপনি যদি চান খেলোয়াড়েরা ফতুর হতে থাকুক, আপনার জন্য উচিত হবে টাকার সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া।

এবার আলোচনা করা যাক ফেডারেল রিজার্ভ নিয়ে। ফেড যখন সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে বেশি বেশি ঋণ দিতে থাকে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য ঋণ নেওয়া সহজ হয়ে যায় এবং সারা বিশ্বে ডলার ছড়িয়ে পড়ে। আবার ফেড যখন সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে ডলার গুটিয়ে আনতে থাকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেউলিয়াত্ব বৃদ্ধি পায়। এভাবে ডলারের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে ফেড বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
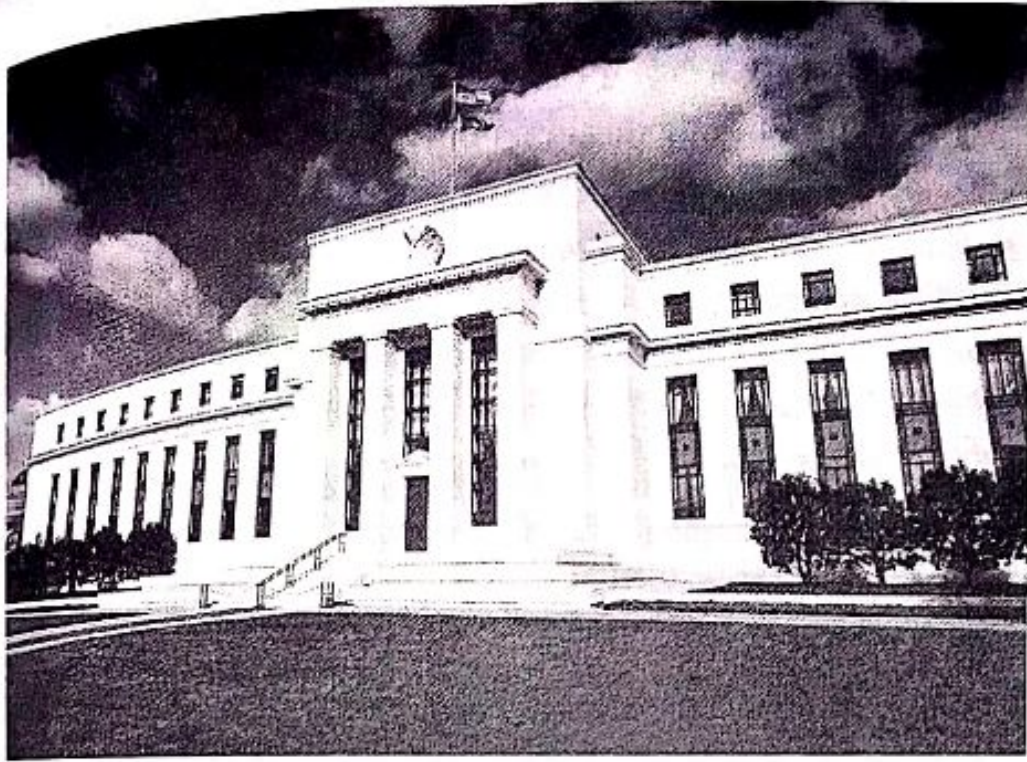
চিত্র : ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক

ইতিপূর্বে আমরা যখন অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্বের ব্যাপারে আলোচনা করেছি, আমরা দেখেছি বিপদে পড়া সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা আরও বেশি ঋণ গিলিয়ে লাইফ সাপোর্ট দেয়। ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এই ব্যবস্থার নাম হচ্ছে মনেটারি পলিসি। এই পলিসিতে ব্যাংক ব্যবস্থা অধিক টাকা ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে এবং এভাবে সুদের হার কমে আসে।* সব মিলিয়ে এই ব্যবস্থায় মোট ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায় না, ঋণের পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকে, তবে সুদের হার কিছুটা কম থাকায় সরকার সাময়িক স্বস্তি পায়। ব্যাংক চাইলে সুদের হার পুনরায় বৃদ্ধি করে খাদের কিনারায় থাকা সরকারকে এক ধাক্কায় খাদে ফেলে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনও ঠিক এমন। ফেডারেল রিজার্ভ যখন অধিক ডলার ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে, তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য ঋণ নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এভাবে সবাই তাদের ঋণের ফাঁদে পড়ে। তারপর যখন তারা

---

* আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, আমি 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিক টাকা ছাপিয়ে' না লিখে 'ব্যাংক ব্যবস্থা অধিক টাকা ছাপিয়ে' লিখেছি। আমি সতর্কভাবেই এই কাজটি করেছি। কারণ, যখন উদার মুদ্রানীতি বা এক্সপানশনারি মনেটারি পলিসি হাতে নেওয়া হয়, তখন কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়, সকল ব্যাংকের জন্য অধিক টাকা তৈরি করা সহজ হয়ে যায়।

সুদের হার বাড়িয়ে দেয় এবং ডলারের পরিমাণ কমিয়ে আনে, তখন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দেউলিয়া হয়ে যায়।

এই ব্যাপারে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ইয়োরোপিয়ান ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এডাম ট্রুজ তাঁর *Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World* বইতে বলেন,

Fed tightening has the predictable effectof cutting off weaker economies in the dollar system from access to vital imports, forcing the rationing of fuel and electric power, and tightening their access to creditin an unbearable way.

Sri Lanka tipped over the edge into default and political crisis. Argentina faced surging inflation and crushing energy import bills. In both cases, their economies were already weak and their debt unsustainable before the current surge in commodity prices, interest rates, and the dollar. But the new conditions contributed to making their situation evidently unsustainable, helping to trigger an open crisis.

Given the drama in Sri Lanka and Argentina and the precarity of low-income countries, one might imagine that 2022 has the makings of a comprehensive debtcrisis like thatin the 1980s. Economic and financial hardship is already afflicting tens of millions of people and will in due course likely affect hundreds of millions. A half-dozen debtor countries or more may find themselves navigating the uncertainties of debt restructuring and sovereign default. In all likelihood, however, we will avoid a systemic crisis of the dollar-based global financial system. The acute pain will be confined largely to the weakest and poorest economies, where local resources are scant and dependence on the dollar is most manifest.[23]

ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রা সংকোচন নীতি দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। (এই নীতির দ্বারা ডলারের পরিমাণ কমে এলে) এই অর্থনীতিগুলো জরুরি আমদানি করার জন্য পর্যাপ্ত ডলার হাতে পায় না। তাদেরকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সীমিত বরাদ্দ বাবদ দিন পার করতে হয়। তবে মুদ্রা সংকোচন নীতি সবচেয়ে বড় যে প্রভাব ফেলে তা হচ্ছে, দুর্বল অর্থনীতিগুলোকে ঋণ থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিমধ্যেই খাদের দ্বারপ্রান্তে থাকা শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং রাজনৈতিক অবস্থার তীব্র অবনতি হয়েছে। এদিকে আর্জেন্টিনা অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং তাদের জ্বালানি আমদানি খরচ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি

23 https://www.tbsnews.net/foreign-policy/world-seeing-how-dollar-really-works-476402

পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয় আসার আগে, অর্থাৎ পণ্যের দাম, সুদের হার ও ডলার রেটের মান বৃদ্ধির আগে থেকেই তারা অর্থনৈতিকভাবে বেশ দুর্বল অবস্থানে ছিল এবং তাদের ঋণের বোঝা মাত্রাতিরিক্ত ছিল। তবে নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা আরও করুণ হয়েছে, যা উন্মুক্ত সংকট তৈরি করেছে।

শ্রীলঙ্কা, আর্জেন্টিনা এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করছে যে ১৯৮০-এর দশকের মতো ২০২২ সালেও বিশ্বে একটি ঋণসংকট তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। চলমান এই অস্থিতিশীলতার কারণে অগণিত মানুষ ইতোমধ্যেই ভোগান্তির স্বীকার হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকলে ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অর্ধডজন বা তার বেশি দেশে ঋণ পুনর্গঠন ও সরকারি ঋণ খেলাপির অনিশ্চয়তা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সবকিছু বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, ডলারভিত্তিক বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার ফলে যে পদ্ধতিগত সংকট তৈরি হয়, তা আমরা (সমৃদ্ধ দেশগুলো) এড়াতে পারব। অস্থিতিশীল এই অর্থব্যবস্থার চরম ভোগান্তির স্বীকার হবে মূলত দুর্বল এবং দরিদ্রতম অর্থনীতিসমূহ, যাদের স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ খুবই কম এবং ডলারের ওপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি।

দেশের নাম	বৈদেশিক ঋণ ($)	তথ্য সংগ্রহের তারিখ	মাথা পিছু বৈদেশিক ঋণ	জিডিপির তুলনায় শতাংশ ঋণ
সাইপ্রাস	১২০ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	১৭,২০০	৮৪১
আয়ারল্যান্ড	২২৮ বিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৪২,০০০	৭০১
মাল্টা	৯১.৩ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	২২৩,০০০	৬১১
সিঙ্গাপুর	১.৮৭ ট্রিলিয়ন	৩০ জুন ২০২১	২৫১,০০০	৪৭১
গ্রিস	৪৪২ বিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৪২,৮০০	২১৮
সুইজারল্যান্ড	১.৮২ ট্রিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	২১৩,১০০	২৮৫
যুক্তরাজ্য	৮.৭৩ ট্রিলিয়ন	জুন ২০২২	১২৯,২০৩	২৭৫
বেলজিয়াম	১.২৬ ট্রিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	১১২,০০০	২৬১
ফ্রান্স	৭.০৪ ট্রিলিয়ন	জুন ২০২২	১০৭,২৪৫	২৫৩
মরিশাস	২৩.২ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	৭,৮০০	২৪৫
লেবানন	১১.৫ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৩	৪৩৪,০০০	২৪০
[illegible]	৩১.৬ বিলিয়ন	৩০ এপ্রিল ২০২২	২,০০০	২২০
ফিনল্যান্ড	১১১ বিলিয়ন	৩১ মার্চ ২০২২	২৪,৫৭৮	২১৮
বাহামাস	১৭.৬ বিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩	৪৪,২০০	১৯৪
স্পেন	২.০৫ বিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	২৬,২০০	১৮০
অস্ট্রিয়া	২.২১ ট্রিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৪৮,৭০০	১৭০
পুয়ের্তো রিকো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	৭৭৭ বিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৬৪,০৫১	১৬৫
জার্মানি	১৫৭ বিলিয়ন	৩১ জানুয়ারী ২০১৫	৪৭,৮০০	১৬৪
[illegible]	৬.৪৬ ট্রিলিয়ন	জুন ২০২২	৭৭,৮০৭	১৬০
ডেনমার্ক	১৪৮ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	১৫,০০০	১৬০
পানামা	৪৯২ বিলিয়ন	৩০ জুন ২০১৭	৮৫,৭০০	১৫৮
মৌরিতানিয়া	১৮.৩ বিলিয়ন	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	৪,৪০০	১৫৭
কানাডা	৪.৪১ বিলিয়ন	২২ মার্চ ২০২১	৬,৭৪২	১৫১
ইতালি	১.৯৩ ট্রিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৫৭,৩০০	১৪৩
	২.৫১ ট্রিলিয়ন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	৪২,৩০০	১৪১

চিত্র– জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত প্রথম ২৫টি দেশের তালিকা (সূত্র– ব্লুমবার্গ টার্মিনাল)

মরণফাঁদ

একটি দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম হলে বাণিজ্য ঘাটতি চলে। বাণিজ্য ঘাটতি ছাড়াও রেমিট্যান্স, ঋণ, অর্থ পাচার, বৈদেশিক বিনিয়োগসহ যত প্রকার আন্তর্জাতিক লেনদেন আছে, তার সবগুলো যোগ-বিয়োগ করে যদি দেখা যায় সম্মিলিত ডলার আয়ের তুলনায় ব্যয় হয়ে যাওয়া ডলারের পরিমাণ বেশি, তখন কী হবে? উত্তরটি জানাতে আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। সংসারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে আপনি কী করেন?

১। সঞ্চয় ভেঙে খরচ করেন,
২। কারও থেকে ঋণ নেন, অথবা
৩। সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেন।

রাষ্ট্রের ব্যাপারটাও ঠিক এমন। কোনো দেশের আয় হওয়া ডলারের তুলনায় ব্যয় হওয়া ডলারের পরিমাণ বেশি হলে দেশটি :

১। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (রিজার্ভ) ভেঙে খরচ করে।
২। কারও থেকে ঋণ নেয়, কিংবা
৩। দেশীয় সম্পদ বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে (foreign investment)

পরিবারের সাথে রাষ্ট্রের একটি পার্থক্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা চলে। এক রাষ্ট্রের মুদ্রা আরেক রাষ্ট্রে চলে না। যেমন বাংলাদেশের টাকা সুইজারল্যান্ডে চলে না। সুইজারল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক ইংল্যান্ডে চলে না ইত্যাদি। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে লেনদেন হয় ডলারে এবং আন্তর্জাতিক ঋণও মূলত ডলারেই হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ঋণ স্থায়ীভাবে ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে না। এটি কেবল সাময়িকভাবে ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তারপর অর্থনীতিতে মোট ডলারের পরিমাণ কমে আসে। বিষয়টি ভালো করে বুঝতে একটি গল্প বলা যাক।

মনে করি, তিনজন জুয়াড়ি ১০০ টাকা করে মোট ৩০০ টাকায় জুয়া খেলা শুরু করেছে। খেলার ১০ দানের পর তাদের সবার হাতে সমানসংখ্যক টাকা থাকবে না, এমনটাই স্বাভাবিক। যে খেলোয়াড় যত এগিয়ে, তার হাতে তত বেশি টাকা থাকবে এবং যে খেলোয়াড় যত পিছিয়ে, তার হাতে তত কম টাকা থাকবে। ধরা যাক, যে খেলোয়াড় সবচেয়ে এগিয়ে, তার হাতে আছে ২০০ টাকা, দ্বিতীয়জনের হাতে আছে ৬০ টাকা এবং শেষজনের হাতে আছে ৪০ টাকা। এমন সময় শেষ দুজনের প্রত্যেকে টেবিল মাস্টারের থেকে ৫০ টাকা করে ঋণ নিল এবং ১০০ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। এর ফলে টেবিলের সব খেলোয়াড়ের ঝুঁকি বেড়ে গেল। কেন ঝুঁকি বেড়ে গেল তা বুঝতে খেয়াল করে দেখুন, ঋণ নেওয়ার সাথে সাথে টেবিলের সদস্যদের হাতে মোট টাকার পরিমাণ ৩০০ থেকে বেড়ে ৪০০ হয়ে গেছে; কিন্তু ঋণ ফেরত দেওয়ার পর মোট টাকার পরিমাণ ৪০০ থেকে কমে ২০০ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঋণের কারবার কেবল টেবিল মাস্টারকে লাভবান করে এবং বাকি সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বোঝা গেল বিষয়টি?

এবার চিন্তা করে দেখুন, একটি 'আদর্শ বিশ্বে' পাঁচটি দেশ ১০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু করল। ১০ বছর পর তাদের সবার হাতে সমানসংখ্যক ডলার থাকবে না, এমনটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা গেল, প্রথম দেশের হাতে আছে ২০০ মিলিয়ন ডলার, পরবর্তী দুই দেশের প্রত্যেকের হাতে আছে ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং শেষ দুটি দেশের প্রত্যেকের হাতে আছে ৫০ মিলিয়ন ডলার। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি আমেরিকা থেকে ঋণ নেয়, অপর দেশগুলো নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে। কারণ, কোনো সদস্য ঋণ নিলে সাময়িক সময়ের জন্য ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে দিন শেষে মোট ডলারের পরিমাণ কমে যাবে। আপনি একটি মাটির ব্যাংকে ১০ টাকা ঋণ দিয়ে ২০ টাকা ফেরত চাইলেন। ব্যাংকের টাকা বাড়বে নাকি কমবে? ঠিক তেমনিভাবে আমেরিকা যেহেতু ডলারের একমাত্র সোর্স এবং সে সারা বিশ্বকে ঋণ দিয়ে অধিক ডলার ফেরত নেয়; ঋণে ডলার প্রদান ও সুদে-আসলে ফেরত নিতে থাকলে সমগ্র বিশ্ব ডলারশূন্য হয়ে যেতে থাকবে এবং আমেরিকার ঋণের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

টীকা : ভেলার ভেলকি

মনে করি, 'কড়িবিহীন' একটি বিশ্বে 'ভেলা' নামের একটি রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রকে ১০টি কড়ি ঋণ দিয়ে বছরান্তে ১১টি কড়ি ফেরত চাইল। ঋণে পাওয়া কড়ি ছাড়া বিশ্বে আর কোনো কড়ি নেই।

ভেলা যদি মোট একশোটি দেশকে ঋণ দিয়ে থাকে, মোট কড়ি দিয়েছে ১,০০০টি। এখন, মোট ১,১০০ কড়ি ফেরত চাওয়াটা কি যৌক্তিক? নিশ্চয়ই না। কারণ, রাষ্ট্রপ্রতি গড়ে ১০টি কড়ি আছে, ১১টি কড়ি তারা দেবে কোথা থেকে? ঋণ নেওয়ার পরই সুদের কড়ি সংগ্রহ করতে তাই রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করবে (মারামারি করাটাও অস্বাভাবিক নয়)। এভাবে সর্বোচ্চ ৯০টি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। তারা সবাই মিলে দেবে ৯০ × ১১ = ৯৯০টি কড়ি। অপরিশোধিত ঋণের দায় পূরণ করতে ঋণগ্রহীতাদের সম্পদ জব্দ করে 'ভেলা'র নামে লিখে নেওয়া হবে।

সুতরাং, সুদি সিস্টেম মানেই সুদি মহাজনের জন্য অবারিত সম্পত্তি অর্জনের দুয়ার খুলে দেওয়া। ভেলা যে খুব কায়দা করে সম্পত্তি অর্জন করছে তা নয়, বরং এটি একটি ফাঁকফোকরবিহীন মেশিন, যা সবার সম্পত্তি নিশ্চিতরূপে চুষে গলাধঃকরণ করে ফেলছে। কিছু দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করে এই মেশিনটি চালানোর দায়িত্ব দিলেই ব্যস নিশ্চিন্ত, মালিক হিসেবে আর কোনো চিন্তা নেই। পেশির জোরে মেশিনটাকে সমাজে বসিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে।

টীকা : আমেরিকা কি কোনো দিন দেউলিয়া হবে?

অনেক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেন, আমেরিকাকে কোনো দিন দেউলিয়া হতে হবে না। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, একটি দেশ স্বদেশি মুদ্রায় ঋণ নিলে দেউলিয়া হয় না। কারণ, নিজ দেশের টাকা নিজেরা ছাপিয়েই সবাই ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারে। রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় মূলত বিদেশি ঋণে। কারণ সে ক্ষেত্রে সে টাকা ছাপাতে পারে না। যেহেতু আন্তর্জাতিক ঋণের বাজার চলে ডলারে এবং আমেরিকার নিজস্ব মুদ্রাও ডলার, বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া আমেরিকার জন্য স্বদেশি ঋণ নেওয়ার সমতুল্য। তাই আমেরিকার কোনো দিন দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

চিন্তার একটি সমস্যা হচ্ছে, সরকার যদি অতিরিক্ত ঋণ নিতে থাকে, তার ক্রেডিট রেটিং কমে যাবে এবং সুদের হার বেড়ে যাবে। সেই হিসেবে যদি আমেরিকার সরকার অতিরিক্ত ঋণ নিতে থাকে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হয়, একসময় ট্যাক্সের টাকা দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও সুদ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। এভাবে একপর্যায়ে মার্কিন সরকারকেও দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে।

এর উত্তরে তাঁরা বলেন, 'ডলারের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক থাকায় এবং ডলার রিজার্ভ মুদ্রা হওয়ায় মার্কিন সরকারের বন্ড সবাই কিনতে চাইবে।

এই চাহিদাতে অভাব হবে না। তাই আমেরিকার সরকারের সঞ্চয়পত্রে সুদের হার সব সময় কম থাকবে এবং মার্কিন সরকার কোনো দিন দেউলিয়া হবে না।'

সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, ডলার যদি রিজার্ভ কারেন্সির পদমর্যাদায় থাকে এবং আমেরিকার অর্থনীতি সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগাতে থাকে, তাহলে মার্কিন সরকারের দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু বাকি সব দেশের ডলারের ঋণে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি আছে।

বাঁচার উপায়

'Blaming the wolf would not help the sheep much. The sheep must learn not to fall into the clutches of the wolf.'

–Michael Hudson

'নেকড়েকে দোষ দিয়ে ভেড়ার কোনো কল্যাণ হবে না। ভেড়াকে অবশ্যই শিখতে হবে কীভাবে নেকড়ের হাতে পড়া থেকে বাঁচতে হয়।'

–মাইকেল হাডসন

কীভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডলারের মরণফাঁদ থেকে বাঁচতে হবে, তা একটি দীর্ঘ আলোচনা। আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে আমরা টেকসই লেনদেন করি না। আমরা অতিরিক্ত ভোগ করি কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করি। অতিরিক্ত ভোগ বলতে বোঝানো হচ্ছে আমরা যতটা উৎপাদন করি, তার থেকে বেশি ভোগ করি এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বলতে বোঝানো হচ্ছে আমরা যতটা ভোগ করি তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করি। যেহেতু বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিকাজের উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। একজন কৃষক চাল, ডাল, ভুট্টা, পেঁয়াজ ইত্যাদি উৎপন্ন করে। কৃষক বাজারে গিয়ে এগুলো বিক্রি করে কাপড়, কাঠ, শণ ইত্যাদি কিনে আনে এবং সংসার চালায়। যা কিছু সে বিক্রি করে, তা হচ্ছে কৃষক পরিবারের রপ্তানি এবং যা কিছু সে ক্রয় করে, তা হচ্ছে কৃষক পরিবারের আমদানি। এই আমদানি-রপ্তানি করার সাধারণ মুদ্রা হচ্ছে টাকা। কৃষকের রপ্তানি যদি বেশি হয়, কিন্তু আমদানি কম হয়, তার ঘরে টাকা জমতে থাকবে (রিজার্ভ বাড়তে থাকবে)। এই টাকা দিয়ে সে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখতে পারে, অথবা শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারে অথবা সোনা কিনে রাখতে পারে। এমন হাজারটা উপায় আছে, তাই তো? রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। যে কৃষকের উৎপাদনের চেয়ে তার ভোগ কম, সে রপ্তানি করতে পারে। ঠিক তেমনি করে যে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি

ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উৎপাদন তাদের মোট ভোগের চেয়ে বেশি, তারা রপ্তানি করতে পারে। আর যে সকল রাষ্ট্রে উৎপাদনের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, তারা ঋণ করে চলে অথবা সঞ্চয় ভেঙে খরচ করে।

তার মানে, আমাদের আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য না হওয়াটাই দেউলিয়াত্বের প্রাথমিক কারণ। কারণ, আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা থেকেই আমরা ঋণ নিই এবং পরবর্তীকালে সেই ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করতে না পেরেই আমরা দেউলিয়া হই।

এবার চিন্তা করে বলুন তো, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে সমাধান কী? উত্তর হচ্ছে আপনাকে আয় বাড়াতে হবে অথবা ব্যয় কমাতে হবে। মনে করুন, মাসে ১০ কোটি টাকা আয় করে আপনি ১২ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এমতাবস্থায় ব্যাংকে যদি আপনার মোট ৩০ কোটি টাকা জমা থাকে, তাহলে ১৫ মাস পরে কী হবে? আয় ও ব্যয় সমান হয়ে যাবে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন। তাই রিজার্ভ শূন্য হয়ে যাওয়া মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া নয়। রিজার্ভ হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়। সঞ্চয় শেষ হয়ে যাওয়া মানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। একেকটি দেশ একেক কাজে সেরা। কোনো দেশে তুলা উৎপন্ন হয় বেশি, আবার কোনো দেশে তেল। কোনো দেশের মানুষ সেলাইয়ে দক্ষ, আবার কোনো দেশের মানুষ পশুপালনে দক্ষ। আবহাওয়া, শারীরিক গঠন, ঐতিহ্য, যোগাযোগসহ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষ হয়। যে দেশ যা উৎপাদন করায় দক্ষ, সে তা রপ্তানি করবে এবং যে দেশ যা উৎপাদন করায় অদক্ষ, সে তা আমদানি করবে। দিন শেষে আমদানি ও রপ্তানি একটি ভারসাম্যে থাকতে হয়। একজন কৃষক যদি তার উৎপাদনের চেয়ে বেশি ভোগ করতে নিজের জমি বিক্রি করা বা ঋণ নেওয়া শুরু করে, তাহলে খুব দ্রুতই তাকে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রের ব্যাপারটাও এমন। আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা যেহেতু দীর্ঘদিন সম্ভব নয়, রপ্তানির চেয়ে আমদানিও বেশি দিন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই কথাটি সত্য। ঋণ যেমন একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনি একটি রাষ্ট্রকেও তা পরাধীন করে দেয়। তাই ডলারকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক চাপ থেকে দূরে থাকার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা এবং ঋণ থেকে একশো হাত দূরে থাকা।

Think What You Do When You Run in Debt: You Give to Another Power over Your Liberty

–Benjamin Franklin

একবার চিন্তা করে দেখুন, ঋণের বোঝায় পড়লে আপনি কী করেন: আপনি অন্য একটি শক্তিকে নিজের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শন করার সুযোগ দিন।

–বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, (৬ জানুয়ারি ১৭০৬–১৭ এপ্রিল ১৭৯০) আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা জনকদের মধ্যে একজন। তিনি একাধারে একজন লেখক, চিত্রশিল্পী, রাজনীতিবিদ, রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, সংগীতজ্ঞ, উদ্ভাবক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং কূটনীতিক। আমেরিকার ১০০ ডলারের নোটের পেছনে তাঁর ছবি সংযুক্ত আছে।

আদর্শ বিকল্প মুদ্রার বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক লেনদেন যেহেতু মূলত ডলারে হচ্ছে, কেবল ঋণ থেকে বাঁচলেই আমরা স্বাধীন এবং চিন্তামুক্ত হয়ে যাব, ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। আমাদের জন্য প্রয়োজন ডলারের বিকল্প মুদ্রা আনা। কিন্তু ডলারের বিকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন মুদ্রা ব্যবহার করা যায়?

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডলারের বিকল্প কী হতে পারে, সেই প্রশ্নের খুব সাধারণ একটি উত্তর হচ্ছে, সোনা। আরেকটি সাধারণ উত্তর হচ্ছে, ক্রিপ্টো মুদ্রা। এই দুইয়ের বাইরে আরও বিভিন্ন প্রস্তাবনা আছে। সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রথমে আমরা আজ জানব একটি মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আদর্শ বিকল্প হয়ে উঠতে হলে তাকে কী কী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত মুদ্রাকে ঋণ সুদের চক্র থেকে মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে আমরা যে মুদ্রাব্যবস্থায় বসবাস করছি, তা মূলত সুদভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এখানে প্রতিটি টাকা ঋণের বিপরীতে তৈরি হয় এবং প্রতিটি টাকার সাথে সুদ জড়িত থাকে। তাই একটি অর্থনীতিতে সময়ের সাথে নিশ্চিতরূপে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। ফলে সরকার বা জনগণ পর্যায়ক্রমে দেউলিয়া হতে থাকে। বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে যেমন সত্য, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সত্য। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আদর্শ বিনিময়মাধ্যম হওয়ার জন্য একটি মুদ্রাকে এমন হতে হবে, যা ঋণ সুদের চক্র থেকে মুক্ত। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সকল মুদ্রাই ঋণ সুদের চক্র থেকে মুক্ত, যেমন কড়ি, সোনা, তামা, লবণ ইত্যাদি। বেশির ভাগ ক্রিপ্টো মুদ্রাও এমন, যেমন বিটকয়েন। পূর্বে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, সরকার চাইলে নিজেই টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বহন করতে

পারে। সেই মুদ্রাও ঋণ সুদের চক্র থেকে মুক্ত। তবে সরকারি মুদ্রা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন মাধ্যম হওয়ার জন্য আদর্শ মুদ্রা নয়। কেন নয় তা আলোচনা করতে দ্বিতীয় পয়েন্টে যাওয়া যাক।

আদর্শ আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে তা হচ্ছে, এর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের হাতে থাকা যাবে না। অন্যথায় ডলার আমেরিকাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছে, ভিন্ন কোনো মুদ্রা অপর এক রাষ্ট্রকে সেই ক্ষমতা প্রদান করবে।

সবশেষে মুদ্রা হিসেবে আমরা যা কিছুই ব্যবহার করি না কেন, তাকে অন্য সব মুদ্রার মতো চারটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। এই বিশেষ চারটি গুণ কী কী, তা আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো।

মুদ্রার একটা বিশেষ দিক হচ্ছে, এর পরিমাণ ও সরবরাহ সীমিত। গাছের পাতা, কিংবা সমুদ্রের ধূলিকণার মতো বিপুল জোগানের কোনো বস্তুকে আমরা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। এমনটি করলে হয়তো আমাদের এক বস্তা টাকার বিনিময়ে এক সের চাল কিনতে হতো। সে ক্ষেত্রে মুদ্রা তার বহনযোগ্যতার গুণটা হারিয়ে ফেলত। একই কারণে সিসাকেও আমরা কোনো দিন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করি না।

মুদ্রার আরেকটি চরিত্র হলো, একে সঞ্চয় করে রাখা যায়। পচনশীল দ্রব্যাদি, যেমন গাছের পাকা ফল বা সমুদ্রের তাজা মাছ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী। এগুলো মুদ্রা হলে আয় করার দুই-এক দিনের মধ্যেই সব ব্যয় করে ফেলতে হতো। সিন্দুকে যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখা যেত না। সুতরাং সহজে নষ্ট হয় না, এমন উপকরণকেই 'মুদ্রা' হিসেবে আমরা বাছাই করব।

এসবের পাশাপাশি মুদ্রাকে হতে হবে সহজে বিভাজনযোগ্য, অর্থাৎ চাইলেই যেন একে ছোট-বড় বিভিন্ন অংশে আয়েশে ভাগ করে ফেলা যায়। খাদ্যশস্য বা লবণ বিভাজনযোগ্য বিধায় এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমরা চাইলেই এক ছটাক, আধছটাক বা পৌনে এক সের লবণ বিনিময় করতে পারি, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনমাফিক কম-বেশি করতে পারি। এটি হচ্ছে মুদ্রার বিভাজনযোগ্যতা। কোনো প্রাণী বা গাড়ি বিভাজনযোগ্য নয় বলেই আমরা এদের মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। যেমন একটি প্রাণীকে দুই ভাগ করলে সে মারা যাবে। আবার একটি গাড়িকে তিন টুকরা করলে গাড়িটিও অকেজো হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিভাজন করলে যে বস্তু তার গুণগত মান হারিয়ে ফেলে, সেই বস্তু মুদ্রা হতে পারে না।

সবশেষে মুদ্রাকে হতে হবে সমতুল্য। দুটি একই মূল্যমানের মুদ্রা গুণে, মানে, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে একই রকম হবে। যেমন দুটি ১ আনার মোহর সব বিবেচনাতেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার এক কেজি বিন্নি ধান স্থানভেদে অভিন্ন গুণসম্পন্ন। দুটি সমমানের মুদ্রা অনুরূপ না হলে লেনদেনে সমঝোতা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ দুটি গরু বা দুটি কাঁঠাল কখনো সম্পূর্ণ এক রকম হয় না। তাই এগুলো দিয়ে লেনদেন করতে গেলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমঝোতায় পৌছাতে পারে না। এ কারণে এগুলো মুদ্রা হিসেবে অচল।

মুদ্রার পরিমাণ সীমিত হলেও এর একটি গুণ হচ্ছে, একে পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খনি আবিষ্কার করার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহার করলে প্রতিবছরই সাগরের তীর হতে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমরা সেগুলোর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।

এবার চলুন আলোচনা করি আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

রিজার্ভ মুদ্রা

একটি মুদ্রা রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার পেছনে অনেকগুলো অর্থনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লক্ষ্য করুন, রিজার্ভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সঞ্চয়। তাই যে দেশের মুদ্রা রিজার্ভ কারেন্সি হবে, সেই দেশটিকে সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য ভালো জায়গা হবে। দেশটিতে সম্পদ স্থানান্তরে বিধিনিষেধ (ক্যাপিটাল কন্ট্রোল) না থাকা; যেমন বিনিয়োগ করতে বিদেশিদের বাধার সম্মুখীন না হওয়া, টাকা ফেরত নেওয়া সমস্যাজনক না হওয়া এবং মুদ্রা লেনদেন উন্মুক্ত হওয়া জরুরি। ধরুন, আপনি সমরখন্দে বিনিয়োগ করবেন। আপনাকে যদি একশোটি ফরম পূরণ করতে হয়, ত্রিশজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় এবং তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়, নিশ্চয়ই আপনি পারতপক্ষে সমরখন্দে বিনিয়োগ করতে যাবেন না। আবার ধরুন, আপনি পিয়ংইয়ংয়ে সহজে বিনিয়োগ করতে পারেন কিন্তু সেখান থেকে টাকা দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় নিশ্চয়ই আপনি সেখানে বিনিয়োগ করতে যাবেন না। সবশেষে মনে করুন কোনো দেশের মুদ্রা এতটাই অপ্রচলিত যে সেখান থেকে টাকা কনভার্ট করে দেশে ফেরত আনতে বিশাল ঝামেলা পোহাতে হয় এবং অনেক মূল্যমান হারাতে হয়। সে ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই আপনি এমন বিনিয়োগ করবেন না। তাই কোনো দেশের মুদ্রাকে রিজার্ভ কারেন্সির পদ অর্জন করতে হলে সেই দেশের দরজা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। সেখান থেকে টাকা আনা-নেওয়া সহজ করতে হবে এবং আইনকানুন ব্যবসাবান্ধব করতে হবে। এই সবগুলো গুণ ডলারের জন্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

কোনো দেশের মুদ্রায় যদি মূল্যস্ফীতি বেশি হয়, সেই দেশে কেউ টাকা সঞ্চয় করতে চাইবে না। দেখা গেল, আপনি ১০০ কোটি টাকায় ব্রাজিল দেশ

থেকে মুদ্রা কিনলেন, পরের বছরেই আপনার সম্পদের মূল্যমান কমে ৭০ কোটি টাকা হয়ে গেল (মূল্যস্ফীতি ৩০%)। এমন ঘটনা বারবার ঘটলে নিশ্চয়ই আপনি ব্রাক্ষ্ম দেশের মুদ্রাতে সম্পদ জমা করতে চাইবেন না। কেবল আপনি কেন, কোনো ব্যক্তিই এমন অস্থিতিশীল মুদ্রায় নিজ সম্পদ সঞ্চয় করতে চাইবে না। তাই একটি মুদ্রাকে রিজার্ভ কারেন্সি হতে হলে মূল্যস্ফীতি অবাঞ্ছিত হওয়া যাবে না এবং মুদ্রার মান খুব তারতম্যশীল হওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত, যে দেশের মুদ্রা রিজার্ভ কারেন্সি হবে, সে দেশের সরকারকে ব্যক্তিসম্পদের উত্তম প্রহরী হতে হবে। সরকার নিজেই যদি হঠকারী হয় এবং যার-তার সম্পদ নিজের নামে লেখা শুরু করে কিংবা আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ যদি ভালো না থাকে, সেই দেশে সম্পদ রাখতে কেউ ভরসা পাবে না।

সঞ্চয়পত্র ও রিজার্ভ মুদ্রা

একটি দেশে মুদ্রাকে রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার জন্য সঞ্চয়পত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে। কোনো দেশের মুদ্রাতে সঞ্চয়পত্রের সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুদ্রা সঞ্চয় করতে পারে না। একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান আপনার দেশে নিরাপদে টাকা সঞ্চয় করে কোথায়? উত্তরে আপনি হয়তো বলবেন, ব্যাংকে। কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখা শতভাগ নিরাপদ নয়। ব্যাংক নিজেও দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে সরকার নিজেও দেউলিয়া হতে পারে, তবে সেই আশঙ্কা ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অপেক্ষা সাধারণত কম হয়। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, অনেক বড় অ্যামাউন্টের ডিপজিট (যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ) সংরক্ষণ করা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাধ্যের বাইরে। তৃতীয়ত, ব্যাংকের চেয়ে বন্ডের সুদের হার বেশি। এই সবকিছু বিবেচনা করে সবাই চায় সরকারি সঞ্চয়পত্র কিনে অর্থ সঞ্চয় করতে। তাই কোনো দেশের মুদ্রাকে রিজার্ভ মুদ্রা হতে হলে সেই মুদ্রায় সঞ্চয়পত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

100

একশত টাকা

চিত্র : বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০০ টাকার সঞ্চয়পত্রের একটি চিত্র।

সঞ্চয়পত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহের পাশাপাশি আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, সুদের হার। বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে, মনে করি, ইয়োরো বন্ডে সুদের হার ০ শতাংশ কিন্তু ব্রিটিশ বন্ডে সুদের হার ১ শতাংশ এবং আমেরিকার বন্ডে সুদের হার ২ শতাংশ। এমন ক্ষেত্রে যে কেউ আমেরিকার বন্ড কিনতে চাইবে। কিন্তু দেখা গেল, রাশিয়ার বন্ডে সুদের হার ৬ শতাংশ এবং গ্রিসের বন্ডে সুদের হার ১০ শতাংশ। তার মানে কি পৃথিবীর সবাই একমাত্র গ্রিসের বন্ড কিনবে এবং বাকি সব দেশের সরকার খালি হাতে বসে থাকবে? না, বাজারে গ্রিসের বন্ড অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ডের চাহিদা বেশি। কিন্তু কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে দ্বিতীয় পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব, তা হচ্ছে ঝুঁকি। যে দেশের সরকার যত নিরাপদ, সেই দেশের বন্ডে তত বেশি আগ্রহ থাকে বিনিয়োগকারীদের। কারণ, রিজার্ভ কারেন্সি হচ্ছে সঞ্চয়ের প্রতীক। তাই বিনিয়োগ করে যদি সঞ্চয় খোয়ানোর আশঙ্কা থাকে, তা রিজার্ভ কারেন্সি না হওয়াই উত্তম। এই কারণেই যে সকল রাষ্ট্রের বন্ডে ঝুঁকি বেশি থাকে, যেমন গ্রিসের বন্ডে, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করে না (করলেও অতি সামান্য পরিমাণে)। সবাই চায় কম ঝুঁকির বন্ডে (AAA বা AA) বিনিয়োগ করতে।

তার মানে কি এই যে সুইজারল্যান্ডের বন্ডে সবচেয়ে কম ঝুঁকি থাকলে সবাই কেবল সেখানেই বিনিয়োগ করবে? না, এখানে একটি ভারসাম্যের ব্যাপার আছে। কম ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি দেশের মধ্যে যে দেশের বন্ডে সুদের হার সবচেয়ে বেশি, সেখানেই সবাই বিনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু তারপরও কেন আমরা এর সমান্তরালে প্রমাণ পাচ্ছি না? উদাহরণস্বরূপ রুশ বন্ড নিরাপদ এবং সেই দেশে সুদের হারও বেশি। সে হিসেবে সবার তো রুশ বন্ড কেনার কথা ছিল। তারপরও রাশিয়ার বন্ডের চাহিদা এত কম কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর আলোচনা করতে তৃতীয় কারণ বিশ্লেষণে চলে যাই। জাপানি মুদ্রা যদি মূল্যমান হারাতে থাকে এবং আমেরিকান ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা জাপানি মুদ্রার তুলনায় আমেরিকার মুদ্রাতে সঞ্চয়পত্র কিনতে বেশি পছন্দ করবে। আবার যদি আমেরিকান ডলার মূল্যমান হারাতে থাকে এবং জাপানি ইয়েনের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা আমেরিকান ডলারের তুলনায় জাপানি ইয়েনের সঞ্চয়পত্র কিনতে বেশি পছন্দ করবে। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। মনে

করি, আমেরিকান বন্ডে সুদের হার ২% কিন্তু ডলারের মূল্যস্ফীতি ১.৫%। তাহলে নিট সুদের হার হচ্ছে ০.৫%। কিন্তু মনে করি, জাপানি বন্ডে সুদের হার ২% কিন্তু ইয়েনের আশাকৃত মূল্যস্ফীতি ১.৯%। তাহলে জাপানের নিট সুদের হার হচ্ছে ০.১%। যদি জাপানি বন্ডের ঝুঁকি আমেরিকার মতোই হয়, সবাই আমেরিকান বন্ডে বিনিয়োগ করতে চাইবে।

এই তিনটি মূল বিষয় ছাড়াও আরও কিছু বিষয় বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ট্যাক্সের পরিমাণ। কোনো দেশে সুদ কিংবা ক্যাপিটাল গেইনের ওপর (বন্ডের দামের পার্থক্যের ওপর) যদি ট্যাক্সের হার বেশি হয়, সেই দেশে চূড়ান্ত রিটার্ন কমে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সুদের ওপর ব্রিটেনে ট্যাক্সের হার ২০ শতাংশ এবং ক্যাপিটাল গেইনের ওপর ট্যাক্সের হার ৪০ শতাংশ। কিন্তু সিঙ্গাপুরে সুদের ওপর ট্যাক্সের হার ১০ শতাংশ এবং ক্যাপিটাল গেইনের ওপর ট্যাক্সের হার ১৫ শতাংশ। উভয় দেশের বন্ডই নিরাপদ, সুদের হার কাছাকাছি এবং মূল্যস্ফীতি কাছাকাছি হলে আপনি সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগ করবেন। কারণ, সে ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ডলারের সঞ্চয়পত্র কিনলে আপনি যদি সুদ পান ৫ হাজার ডলার, ব্রিটেনে ট্যাক্স দিতে হবে ১০০০ ডলার, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ট্যাক্স দিতে হবে ৫০০ ডলার। ক্যাপিটাল গেইনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন।

সব মিলিয়ে একটি দেশের মুদ্রাকে রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার জন্য সেই দেশের মুদ্রাতে সঞ্চয়পত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে, মূল্যস্ফীতি লাগামের মধ্যে থাকতে হবে, সম্পদ স্থানান্তর সুবিধাজনক হতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এমন কোন মুদ্রা কি পৃথিবীতে আছে?

বি.দ্র.: বর্তমানে রাশিয়াতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, সুদের হার উত্তম এবং সরকারের ঋণের বোঝা সীমিত (অর্থাৎ ঝুঁকি কম)। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন রকম পশ্চিমা অবরোধের কারণে রাশিয়াতে সম্পদ আনা-নেওয়া করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। অন্যথায়, রাশিয়ান রুবল একটি সম্ভাবনাময় রিজার্ভ মুদ্রা হতো।

আঞ্চলিক বিকল্প মুদ্রা

২০০০ সালের পয়লা জানুয়ারিতে ইয়োরোপে নতুন একটি সাধারণ মুদ্রা চালু হলো। এই সাধারণ মুদ্রার নাম হচ্ছে ইয়োরো। এটি চালু হওয়ার ফলে ইয়োরোপের দেশগুলো নিজেদের মাঝে অভিন্ন মুদ্রাতে লেনদেন করতে সক্ষম হলো। এর আগে ইয়োরো জোনের দেশগুলোর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মুদ্রা ছিল। তাই তারা নিজেদের মাঝে লেনদেন করতে ডলার ব্যবহার করত। কিন্তু অভিন্ন মুদ্রা চালু হওয়ার পর ইয়োরো জোনের দেশগুলোর আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা থাকল না। একটি দেশের দুটি ভিন্ন ব্যাংক যেভাবে নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে, সেভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে গেল। সব মিলিয়ে ইয়োরো হয়ে দাঁড়াল ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্যে কুঠারাঘাত।

ইয়োরো যাত্রা করার পর অনেকে মন্তব্য করতে থাকল, এই মুদ্রা একদিন ডলারকে প্রতিস্থাপিত করবে। কিন্তু বাস্তবে ইয়োরো জোনের বাইরে বড় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারই রাজ আসন দখল করে রাখল। ইয়োরো সফল হলে ডলারের জন্য সবচেয়ে বড় যে সমস্যা হতে পারে তা হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইয়োরোর আদলে আঞ্চলিক মুদ্রা গড়ে উঠতে পারে। মনে করেন, ইয়োরোপের সাফল্য দেখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মাঝে অভিন্ন আঞ্চলিক মুদ্রা চালু করে বসল। তখন আসিয়ান (asean) অঞ্চলে যত অভ্যন্তরীণ লেনদেন হবে, সবই হবে সেই মুদ্রাতে। এভাবে দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন অঞ্চলে যদি একের পর এক অভিন্ন আঞ্চলিক মুদ্রা গড়ে ওঠে, ডলারের সক্ষমতা কিছুটা কমবে। বর্তমানে আমরা এমন একটি বিশ্বে বসবাস করছি, যেখানে আমেরিকা থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত নিকটতম প্রতিবেশী দুটি দেশও ডলারে লেনদেন করে (যেমন চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া)। তাই আমেরিকার কাছে সবাই পা-বন্দি থাকে। যদি বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক মুদ্রা গড়ে ওঠে, তাহলে এই সমস্যার নিরসন হবে।

ইয়োরো সফল হলে ডলারের স্বার্থে দ্বিতীয় যে আঘাত লাগতে পারে, তা হচ্ছে ইয়োরো জোনের বাইরের দেশগুলো ইয়োরো জোনের সাথে বাণিজ্য করতে ডলার পরিত্যাগ করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ইয়োরোপে তৈরি পোশাক রপ্তানি করলে আমরা ডলার অর্জন করি। আবার জার্মানি, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ডসহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে যন্ত্রপাতি বিক্রি করলে ডলার অর্জন করে। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য লেনদেন চলতে থাকে। কিন্তু ইয়োরো যদি সফল হয়, এ-জাতীয় কার্যক্রমে ডলারকে বাইপাস করে আমরা ইয়োরোতে লেনদেন করতে পারি। তখন তৈরি পোশাক রপ্তানি করে আমরা ইয়োরো পাব এবং ইয়োরো জোন থেকে যানবাহন, কেমিক্যাল, চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি কিনতে আমাদের ইয়োরো খরচ করব। সব লেনদেন শেষে যদি বছরান্তে আমাদের হাতে বাড়তি ইয়োরো সঞ্চিত থাকে, সেগুলো দিয়ে আমরা সঞ্চয়পত্র কিনব কিংবা বিনিয়োগ করব। এভাবে ইয়োরোর মতো যদি বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক মুদ্রা সফল হতে থাকে, আমরা কয়েকটি মুদ্রাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে পারব এবং সারা বিশ্বে ডলারের আধিপত্য অনেকটা কমে আসবে।

চিত্র : ইয়োরোর নোট ও কয়েন

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষুদ্র কোনো রাষ্ট্রের মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়লে তারা ইয়োরো ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে এমন ক্ষেত্রে সাধারণত ডলার ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভেনেজুয়েলাতে হাইপার মূল্যস্ফীতি শুরু হওয়ার পর পূর্বের সব টাকা কাগজের মতো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তখন মানুষ ডলার সংগ্রহ করে লেনদেন শুরু করে। এমনকি কিছুদিন পর দোকানপাটে দরদাম ডলারে লেখা শুরু হয়। রাস্তার পাশের কফি শপ থেকে শুরু করে আসবাবপত্রের দোকান পর্যন্ত প্রতিটি জায়গা ডলারভিত্তিক হয়ে যায় পড়ে। বর্তমানে ভেনেজুয়েলাতে গেলে আপনার মনে হবে আপনি একটুকরা আমেরিকাতে আছেন। এমন ঘটনা কেবল ভেনেজুয়েলা নয়, অনেক দেশের

ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছে (এল সালভাদর, জিম্বাবুয়ে)। এমনকি কিছু কিছু রাষ্ট্রে মার্কিন ডলার স্বীকৃত মুদ্রা হিসেবে পর্যন্ত স্থান পেয়েছে, যেমন পূর্ব তিমুর। ব্যাপার হচ্ছে একটি দেশ যখন ডলার ব্যবহার করে বা ডলারকে অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তখন ডলার আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই ইয়োরো যদি সফল হয়, বিভিন্ন বিপর্যস্ত দেশ ডলারের পাশাপাশি ইয়োরোতেও লেনদেন করতে পারবে এবং ইয়োরো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

চতুর্থত, ডলারে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে দুটি ভিন্ন দেশ নিজেদের মাঝে ইয়োরোতে লেনদেন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইরান এবং রাশিয়া উভয়ে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মুখে আছে। এমন যদি হয় যে ইয়োরোপের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে ইয়োরোতে বাণিজ্য শুরু করতে পারে। এভাবে তারা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণকে বাইপাস করতে পারে।

সব মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো দিন চাইবে না ইয়োরো বা অন্যান্য আঞ্চলিক মুদ্রা সফল হোক।

আন্তর্জাতিক সমাধান

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের বিকল্প নিয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের অনেকের মতে ধাতব মুদ্রা, যেমন সোনা হচ্ছে উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা। তবে সোনা, রুপা দিয়ে কি ডিজিটাল যুগে আন্তর্জাতিক লেনদেন করা সম্ভব?

লক্ষ্য করুন, বর্তমানে আমরা যে টাকা ব্যবহার করছি, তা একটি বস্তুগত দ্রব্য (কাগজ)। আমরা কাগজ ধরতে পারি, দেখতে পারি, কিন্তু এর বিপরীতে তৈরিকৃত ডিজিটাল মুদ্রা আমরা ধরতে বা দেখতে পারি না। তারপরও ডিজিটাল মুদ্রাতে কাগজের টাকার মতোই আমরা লেনদেন করি। একইভাবে সোনার বিপরীতে আমরা ডিজিটাল সোনার মুদ্রা ইস্যু করতে পারব। সোনা দেখতে বা ছুঁতে পারলেও সোনার বিপরীতে তৈরিকৃত ডিজিটাল মুদ্রা আমরা দেখতে বা ছুঁতে পারব না।

এক্ষেত্রে একটি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তা হচ্ছে, যতগুলো সোনা সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে, কেবল তার বিপরীতেই একেবারে সমানসংখ্যক ডিজিটাল মুদ্রা তৈরি করতে হবে। যখন কেউ লেনদেন করবে, তখন ডিজিটগুলো এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে এবং যে কেউ চাইলে ডিজিটগুলো ভেঙে সোনা তুলে আনতে পারবে।

কেউ যদি সোনা না রেখে মিথ্যা কিছু ডিজিট লিখে দেয়, তখন কী হবে? একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, বর্তমানেও টাকা ছাড়া মিথ্যা ডিজিট লিখে দিতে পারি আমরা। কিন্তু বাস্তবে কি সবাই তা করতে পারছে? না, তা পারছে না। তার কারণ, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা আছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তৎপর আছে। বর্তমানে যেভাবে টাকা ছাপানো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে, কিংবা যেমনে ইচ্ছা তেমনে ডিজিট লিখে টাকা বলে চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, ঠিক তেমনি করে সোনার মুদ্রাতেও ডিজিটাল লেনদেন করা সম্ভব।

মনে করেন, আপনি রকমারি থেকে একটি বই অর্ডার করলেন। আপনি স্বর্ণালি ব্যাংক থেকে এক গ্রাম সোনা রকমারির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিলেন। এই লেনদেনে প্রথমে কেবল ডিজিটগুলো বদলাবে। প্রথমত, স্বর্ণালি ব্যাংকের ভল্টের সোনার পরিমাণ এক গ্রাম কমবে এবং রকমারির ব্যাংকের ভল্টের সোনার পরিমাণ এক গ্রাম বাড়বে। এভাবে সারা দিন ব্যাংকগুলোর মাঝে বিভিন্ন রকম লেনদেন হবে। দিন শেষে তাদের নেট হিসাব অনুযায়ী যে লেনদেন থাকবে, তা বর্তমানে যেমন গাড়িতে করে টাকা ট্রান্সফার করা হয়, তেমনি করে সোনার বার ট্রান্সফার হবে। এককথায়, বর্তমানের মতোই সবকিছু থাকবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে বর্তমানে আমরা কিন্তু ডিজিটাল মানিকে সত্যিকারের অর্থে পরিণত করে ফেলেছি। অর্থাৎ আমরা যে ডিজিটগুলো দেখি, সেগুলোর সবগুলোর বিপরীতে কাগুজে মুদ্রা নেই। অর্থাৎ অনেক ডিজিট আছে, যেগুলো নিজেই টাকা। এগুলোর পিছে কিছু নেই। সেজন্য ব্যাংকে গিয়ে সব গ্রাহক ক্যাশ আউট করতে চাইলে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়।[২৪] সোনার ক্ষেত্রে এমনটি করা যাবে না।

সোনা ব্যবহার করার একটি উপকারী দিক হচ্ছে, সোনার উৎপাদন কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রে নেই। সোনা বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হয়। তাই একটি নির্দিষ্ট দেশের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ভয় নেই। সোনার আরেকটি উপকারী দিক হচ্ছে, সময়ের সাথে নতুন নতুন খনি আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং সোনার সরবরাহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া খনি থেকে সোনা তোলা বেশ জটিল প্রক্রিয়া। তাই কাগুজে টাকার মতো হুট করে সোনার উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করে ফেলা যায় না। আবার যে পরিমাণ সোনা একবার উৎপাদিত হয়ে গেছে, তা কমানোও যায় না। সবশেষে ডিজিটাল টাকার মতো এর অস্তিত্ব বায়বীয় না। তাই মন চাইলেই সোনা গায়েব করে দেওয়া যায় না।

স্বর্ণমুদ্রার আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে স্বাধীনতা। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি খাঁটি সোনার মুদ্রার পরিমাণ[২৫] নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই আপনার হাতে

---

২৪ মনে করেন, ব্যাংক 'ক' ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ করে আপনাকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। আপনিও কিছুদিন পর ডিজিটাল মুদ্রায় সব ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করে দিলেন। তার মানে সমাজে স্থায়ীভাবে কিছু ডিজিটাল টাকা তৈরি হয়ে গেল। এখন যদি সবাই তাদের ডিজিটাল টাকাকে ফিজিক্যাল ক্যাশে পরিণত করতে চায়, ব্যাংক পড়বে মহা বিপদে।

২৫ সিলমোহর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই খাঁটি সোনার মুদ্রা লিখেছি।

যে পরিমাণ সোনা আছে, তা ব্যবহারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। উদাহরণস্বরূপ মনে করেন, একটি এলাকা নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করল। বর্তমানে সরকার চাইলে সেই স্বাধীনতাকামী নেতাদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিতে পারে কিংবা পুরো এলাকাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি কাঁচা সোনার মুদ্রায় লেনদেন করি, আমাদের অর্থকে এভাবে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

অনেকে বলতে পারেন, বস্তুগত কাগুজে মুদ্রাও তো একই রকম। জি, একই রকম, কিন্তু সরকার চাইলে কাগজের মুদ্রা বাড়তি ছাপিয়ে বা হ্রাস করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী মানসিকতা। দ্বিতীয়ত, কাগজের টাকা কেউ তৈরি করতে পারে না। কিন্তু আপনি চাইলে খনি থেকে তুলে সোনা ব্যবহার করতে পারেন বা আপনার অলংকারকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এখানে কারও অনুমোদন লাগে না। তৃতীয়ত, আপনি সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা না করে নিজেরা মিলে একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারেন। এর জন্য সরকারের অনুমতি লাগে না। কারণ, সোনা সরকারের তৈরি করা কিছু না।

মন্তব্য

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে আকৃতি, সেই তুলনায় সোনার বাজারমূল্য অনেক কম। সোনাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সোনার পরিমাণ অনেক বেশি হতে হবে অথবা সোনার বাজারমূল্য অনেক বেশি হতে হবে। তারপরও ধরা যাক বর্তমান বাজারেই আইন করে সোনাকে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এমনটা করলে সোনার দাম আকাশে রওনা দেবে। এর দ্বারা সোনা সংগ্রহকারী ব্যক্তিরা অনেক ধনী হয়ে যাবে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে। তাই এখন সোনায় লেনদেন শুরু করলে হয়তো দেখা যাবে, বর্তমানে যারা অভাবগ্রস্ত, তারা অভাবেই আছে এবং বর্তমানে যারা মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে, তারাই সিংহভাগ সোনার মালিক।

সোনা ব্যবহার করার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে সোনার খনি নেই। তাই মুদ্রা হিসেবে সোনাকে ঘোষণা করলে যে দেশগুলোতে

সোনার খনি আছে, তারা দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। অনেকটা মোটরযান আবিষ্কার হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর মতো। এদিকে সমস্যা হচ্ছে, যাদের হাতে সোনার খনি নেই, তারা এই দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। তাই এই সমাধান অনেক দেশ মানতে চাইবে না।

টাকার ব্যাপারটা ভিন্ন। এখানে প্রত্যেক দেশের হাতে নিজ নিজ মুদ্রা উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। মুদ্রা তৈরির জন্য এক দেশ আরেক দেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। এজন্য অনেকেই সোনাতে লেনদেন করতে বিরোধিতা করবে।

ওপরের সমস্যার একটি সমাধান হচ্ছে, সোনার পাশাপাশি রুপা, তামা ও নিকেল ইত্যাদিকে সামনে আনা। সোনা, তামা, নিকেল এবং রুপার খনি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর আরও বেশি জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সে হিসেবে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরও বেশি দেশের হাতে ছড়িয়ে যাবে। তারপরও অনেক দেশেই (যেমন বাংলাদেশে) এই ধাতুগুলোর একটিরও খনি পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাছাড়া তামা ও নিকেল দিয়ে আমরা অনেক জরুরি কাজ সম্পন্ন করি। তাই এগুলোকে মুদ্রা হিসেবে হাতে হাতে ঘোরানোও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদিকে সোনা এবং রুপার কোনো ব্যবহার নেই। এগুলো উত্তোলনে কোটি কোটি ডলার ব্যয় না করে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর খাতে, যেমন খাদ্য, শিক্ষা, সুশাসন ও চিকিৎসা খাতে এই টাকা বিনিয়োগ করা উত্তম।

সোনা ব্যবহার করার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, এটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছোট লেনদেনে, যেমন একটি কলম কিনতে আমরা এক টুকরা ক্ষুদ্র সোনার কণা বিনিময় করতে পারি না।[২৬] তাই ঐতিহাসিকভাবেই সোনাতে সব ধরনের লেনদেন সম্পন্ন হতো না। এর সমাধানস্বরূপ রুপা, তামা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। তবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহু দেশ তামা বা রুপা উৎপাদন করে না। আবার একেবারে ছোট লেনদেনে যেমন এক কাপ চা কিনতে বা লজেন্স কিনতে রুপা ও তামা ব্যবহার করাটা সমস্যাজনক। সে ক্ষেত্রে সমাধান কী? এর একটি সমাধান হচ্ছে কড়ি। ছোট ছোট পর্যায়ে আমরা কড়ি দিয়ে লেনদেন করতে পারি। এভাবে প্রতিটি দেশ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে

---

[২৬] ছোট কণার ডিজিটাল লেনদেন বা সোনাভিত্তিক কাগজে মুদ্রার লেনদেন সম্ভব।

প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য দ্রব্য দিয়ে নিত্যদিনের স্বাভাবিক লেনদেন করতে পারে এবং ধাতব মুদ্রা (যেমন সোনা, রুপা ইত্যাদি) দিয়ে আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে পারে।

টীকা : সোনার নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে?

পৃথিবীর বেশির ভাগ সোনা পশ্চিমা ব্যাংকারদের, বিশেষ করে অ্যাংলো স্যাক্সনদের হাতে কেন্দ্রীভূত আছে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার ব্যাংকগুলো তাদের নিজ দেশের সোনা কেন্দ্রীভূত করেছে ফালি ফালি কাগজের বিনিময়ে। ঔপনিবেশিক সম্পদ আহরণের জেরে সবচেয়ে বেশি সোনা এখন পর্যন্ত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে আছে।

এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কি আবারও গোল্ড মানি ফিরিয়ে আনা সম্ভব? আমি বলব, সম্ভব। তবে ফিরিয়ে আনাটা কতটা উপকারী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মনে করেন, আমার হাতে পৃথিবীর অর্ধেক সোনা কেন্দ্রীভূত আছে। এমতাবস্থায় আমি চাইলে মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিশ্বব্যাপী সোনার দাম বেড়ে যাওয়া মানে আমি সম্পদশালী হয়ে যাওয়া। তবে সবচেয়ে বড় পয়েন্টটি হচ্ছে, সুদ অব্যাহত থাকলে যেভাবে সব টাকা একটি কেন্দ্রে আসে, ঠিক তেমনি সুদ অব্যাহত থাকলে সব সোনা এক কেন্দ্রে চলে আসবে। যেহেতু বর্তমান ব্যাংকগুলো দেদার সুদের কারবার করে যাচ্ছে, সোনা বা রুপার মুদ্রা চালু করলে আমাদের গায়ের অলংকার খুলে সুদ পূরণ করতে হবে, অন্যথায় সকলকে দ্রুত দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে।

ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প মুদ্রা

অনেকে দাবি করেন, সোনা এবং রুপার কোনো ব্যবহার নেই। এগুলো উত্তোলনে এত বিনিয়োগ না করে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান বিশ্বের নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি উপাদান হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাই বিদ্যুৎকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করলে মন্দ হয় না। অনেকের কাছে বিষয়টি খুব অবাক লাগতে পারে যে বিদ্যুৎ আবার মুদ্রা হয় কীভাবে? ভেবে দেখুন, রোমান সাম্রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ছিল লবণ এবং এই লবণকে তারা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেই হিসেবে বর্তমান যুগের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিদ্যুৎকে কি আমরা আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না? অবশ্যই পারি। কিন্তু কীভাবে পারি, সেই বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। মনে করেন, আপনি আপনার প্রতিবেশীর থেকে চাল কিনবেন। বর্তমানে আপনি টাকা বা পয়সায় চাল কেনেন। চাইলে সোনা বা রুপা দিয়েও কেনা সম্ভব। কিন্তু বিদ্যুৎ যদি মুদ্রা হয়, আপনি তার কাছে দুই ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করবেন এবং সে আপনাকে এক কেজি চাল দেবে। এই কথা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন আর ভাবছেন, আমরা কি পকেটে করে বিদ্যুৎ নিয়ে ঘুরব? নাকি আলমারির ড্রয়ারে বিদ্যুৎ সাজিয়ে রাখব? বাস্তবে এগুলোর কোনোটাই করতে হবে না। এখন আপনারা যেমন কাগজের নোট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি করে আপনার কাছে বিদ্যুতের কাগজ বা কার্ড থাকবে। কিছু কিনতে হলে বিদ্যুতের কার্ড দিয়ে এক ঘষা দেবেন এবং ইউনিট ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ধরুন আপনি বাসে করে দূরে কোথাও যাবেন। এর মূল্য হচ্ছে দশ ইউনিট বিদ্যুৎ। আপনার পকেটের কার্ডে বাকি আছে ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ, আপনি কার্ড দিয়ে টিকিট কাটবেন। প্রথমে আপনি টিকিট বাছাই করে কার্ড নম্বর ও পাসকোড দেবেন। এভাবে টিকিট কাটার পর আপনার কার্ডে বাকি থাকবে ৪০ ইউনিট বিদ্যুৎ। আপনি চাইলে এই ইউনিটগুলো দিয়ে বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করতে

পারবেন, অথবা কাউকে ধার দিতে পারবেন অথবা এগুলোর বিনিময়ে জমি, বাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কিনতে পারবেন। যেহেতু বিদ্যুতের চাহিদা সবার আছে, সবাই ইউনিট হাতে পেতে চাইবে। কোনো কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে হাতে থাকা ইউনিটের মূল্য বেড়ে যাবে। আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমে গেলে হাতে থাকা ইউনিটের মূল্য কমে যাবে। উৎপাদন খরচ ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিদ্যুতের চাহিদা, কর ইত্যাদি ইউনিটের দামকে প্রভাবিত করতে পারে।

সবশেষে বিদ্যুৎ একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবেও কাজ করতে পারবে। কারণ, বিদ্যুৎ সারা বিশ্বের একটি কমন কমডিটি। পরিবেশ বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করতে কেবল নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমরা।

অনেকে প্রস্তাব দেন, দেশীয় পর্যায়ে কাগজের মুদ্রা থাকুক কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধাতব বা ডিজিটাল বা অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহৃত হোক। এই প্রস্তাবটিও মন্দ নয়। কারণ, কাগজের মুদ্রা যে সব সময় খুব খারাপ কিছু, ব্যাপারটা এমন নয়। কাগজ একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাগজ নিজে ভালো বা মন্দ হতে পারে না। কাগজ যা রিপ্রেসেন্ট করে, তা-ই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কাগজের মুদ্রাকে একবাক্যে খারাপ না বলে মুদ্রার ক্ষমতা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বর্তমানে মুদ্রাব্যবস্থার সমস্যা ফিয়াট মানি না। সমস্যা হচ্ছে টাকার সাথে ঋণ এবং সুদের সম্পর্ক। এই জুলুমে পরিপূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসার একটি সুন্দর পন্থা হচ্ছে সরকারি টাকা। সরকার নিজেই যদি টাকা ছাপানোর দায়িত্ব নেয়, তাহলে সমাধান অনেক সহজ হয়ে যায়। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ এক দিনে তুলে ফেললে যেহেতু অর্থনীতিতে ধস নামবে, সেহেতু যা করা যেতে পারে তা হচ্ছে, প্রতিবছর একটু একটু করে রিজার্ভের পরিমাণ বাড়ানো। এটি জোরপূর্বক না করে বরং ব্যাংকের ঋণ নতুন করে দেওয়া কমিয়ে ধীরে ধীরে (ঋণ) টাকার পরিমাণ কমানো হবে। যেহেতু টাকা কমছে, সেহেতু সরকার নিজে টাকা ছাপিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করবে এবং জনগণ কোনো ট্যাক্স, ভ্যাট বা শুল্ক দিবে না। ছাপানো টাকা দিয়ে সরকার রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করবে। তাহলে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-অসন্তোষ হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা কমে আসে।

ক্রিপ্টো মুদ্রা হতে পারে আন্তর্জাতিক লেনদেনের আরেকটি উত্তম মাধ্যম। ক্রিপ্টো মুদ্রার অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি একটি স্বাধীন মুদ্রাব্যবস্থা। এখানে আপনার ওপর কেউ নজরদারি করতে পারবে না। সরকার এসে আপনার টাকা ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং কেউ আপনার

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারবে না। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এখানে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। কারও কাছে কাগজ জমা দেওয়া বা ফাইল রেডি করার ঝামেলা নেই। ইন্টারনেটে অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি নিজেই নিজের ব্যাংক হয়ে যান। তবে ক্রিপ্টো মুদ্রার সবচেয়ে বড় অর্জন এই যে এটি দিয়ে সুদের কারবার শুরু হয়নি। ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত ক্রিপ্টো মুদ্রাতে ঋণ আদান-প্রদান শুরু করেনি। তাছাড়া ক্রিপ্টো মুদ্রাকেন্দ্রিক কোনো ভিন্ন ধারার ঋণ আদান-প্রদান সংস্থা চালু হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে চালু হবে, তবে বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের অতি উৎসাহে এই মুদ্রা এত ভোলাটাইল যে ঋণ লেনদেন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। বলা যায়, সেজন্যই এই মুদ্রা সুদমুক্ত আছে।

সবশেষে বলতে পারি, মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম। আমরা বিনিময়ের মাধ্যমকে যদি বিনিয়োগের বস্তুতে কিংবা সুদের কারবারে রূপান্তর করি, হোক সে সোনা, রুপা কিংবা ক্রিপ্টো মুদ্রা–সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই সুন্দর একটি অর্থব্যবস্থা দাঁড় করাতে আমাদের জন্য উচিত হবে সুদমুক্ত, স্থিতিশীল এবং স্বাধীন মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

চিত্র : বর্তমানে বহুল প্রচলতি ৩০টি ক্রিপ্টো মুদ্রার নাম ও লোগো

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ কি দ্রুত দেউলিয়া হয়ে যাবে?

বাংলাদেশ দ্রুত দেউলিয়া হয়ে যাবে কি যাবে না, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দুই ধাপে ব্যাখ্যা করছি।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে কি না।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের মোট ঋণ জিডিপির ৩৫.৫ শতাংশ। আপনি যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, তাদের দেশে জিডিপির তুলনায় মোট ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। অনেক দেশে এই সংখ্যা ১০০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের বেশির ভাগ দেশও বাংলাদেশের তুলনায় অধিক ঋণগ্রস্ত। সে হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে কম ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। তাই আপনার মনে হতে পারে বাংলাদেশের সহসা দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা নেই।
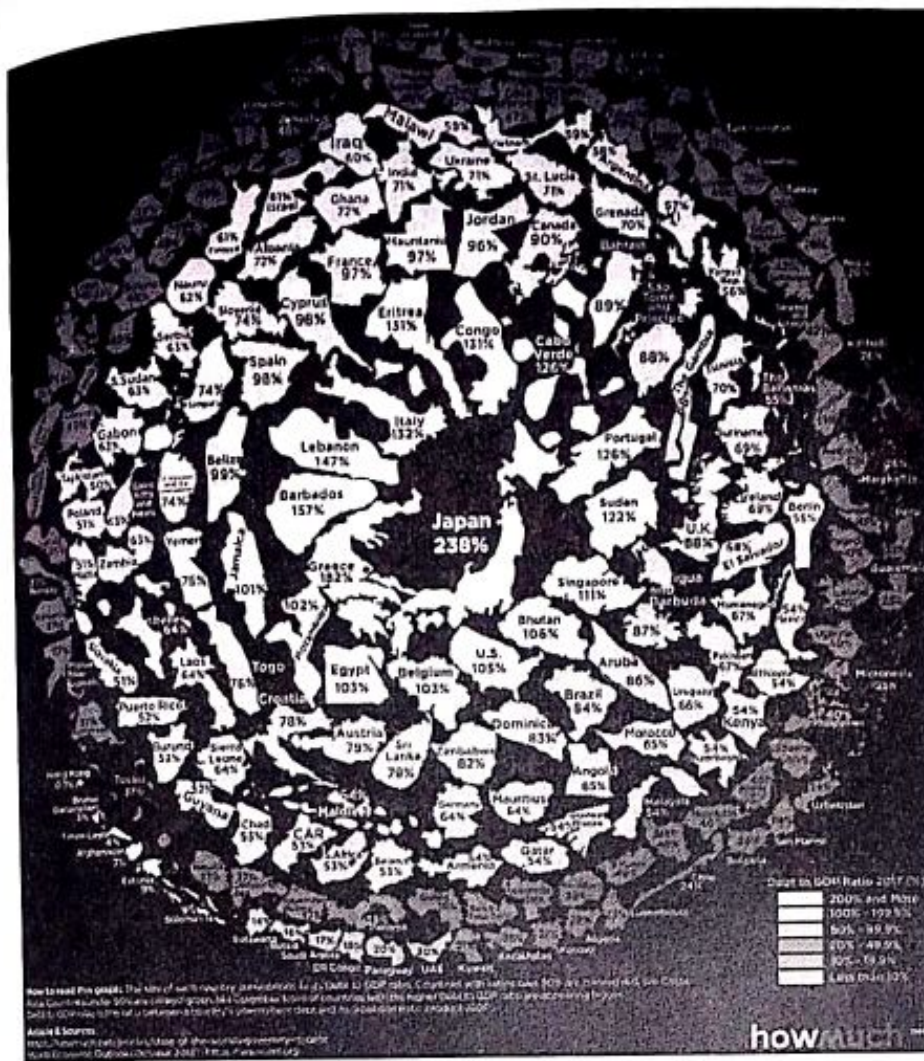
চিত্র : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জিডিপির তুলনায় ঋণের শতাংশ (২০১৭ সাল), ওপরের বাম পাশের কোনায় দেখা যাচ্ছে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ ছিল জিডিপির ৩৩%, যা বিশ্বের সবচেয়ে কম ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর একটি।

কিন্তু একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলে আমরা লক্ষ্য করতে পারব জিডিপির তুলনায় সরকারি রাজস্ব আদায়ের হারে বাংলাদেশ একেবারে তলানিতে অবস্থিত। আমাদের দেশের জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আদায় হয় মাত্র ৯.৩১ শতাংশ, যা কিনা কর আদায়ে বিশ্বের সর্বনিম্ন বিশটি দেশের মধ্যে একটি।[২৭] তাই আমাদের দেশের সরকারের ঋণগ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

অনেকে মন্তব্য করতে পারেন, আমরা আপেলের সাথে আপেলের তুলনা করতে পারি। কিন্তু আপেলের সাথে কমলা তুলনীয় নয়। যেহেতু পৃথিবীর

---

27 https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS

একেক দেশের সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার একেক রকম, সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি পরিমাপ করতে পারি। এর একটি সহজ উপায় আপনাদের শিখিয়েছি, তা হচ্ছে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার দেখা। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের দশ বছরের সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ৮.৫% (বর্তমানে চীনে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ৩%, যুক্তরাজ্যে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ৪.২% এবং ভারতে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ৭.৩%)। সুদের হারের বিচারে বাংলাদেশের অবস্থা ভালো নয়। তবে সুদের হারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যারোমিটার হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আদায়ের তুলনায় সুদে ব্যয় কত? কারণ, সুদের টাকা আদায় করতে না পারলে একটি দেশের সরকার দেউলিয়া হয়। আবার নতুন ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সুদ প্রদানের সক্ষমতা অতীব জরুরি নিয়ামক। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, যে দেশের সরকারের বাজেটে রাজস্ব আদায়ের তুলনায় সুদের পিছে ব্যয় যত বেশি, সেই দেশের সরকার দেউলিয়াত্বের তত দ্বারপ্রান্তে। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আমরা দেখব সেই বিচারে বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয়। নিচে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সুদে জর্জরিত দেশগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

দেশের নাম	সর্বশেষ বছর	সরকারের রাজস্ব আয়ের তুলনায় শতকরা সুদের ব্যয়
শ্রীলংকা	২০২০	৭১.৪
ঘানা	২০২০	৪৪.৬
জাম্বিয়া	২০২০	৩৮.৮
মিশর	২০১৫	৩৩.৩
বার্বাডোজ	২০১৬	২৫.৬
অ্যাঙ্গোলা	২০১৯	২৪.৮
কেনিয়া	২০২০	২৪.১
ভারত	২০১৮	২৩
জ্যামাইকা	২০২০	২২.৪
ব্রাজিল	২০২০	২১.৭
ডোমিনিকান রিপাবলিক	২০২০	২১.৬
পানামা	২০২০	২১.৪
বাংলাদেশ	২০২০	২১.১
লেবানন	২০২০	২১
মালাউই	২০২০	২০.৭
ইন্দোনেশিয়া	২০২০	১৯.১
কোস্টারিকা	২০২০	১৯.১
পাপুয়া নিউ গিনি	২০২০	১৭.৯
জর্ডান	২০২০	১৭.৭
ইকুয়েডর	২০২০	১৭
বাহামা	২০২০	১৬.৫
ফিজি	২০২০	১৬.৩
মেক্সিকো	২০২০	১৫.৪

চিত্র– সরকারের আয়ের তুলনায় শতকরা সুদের ব্যয় (সূত্র: বিশ্বব্যাংক)

লক্ষ্য করে দেখুন, বাংলাদেশ যে হারে সুদের পিছে ব্যয় করছে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই হারে ব্যয় করা দেশগুলোর বেশির ভাগই দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিতে আছে (পূর্বে আপনাদের সাথে তালিকা শেয়ার করা হয়েছিল)। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি, অভ্যন্তরীণ ঋণে বাংলাদেশ সরকার দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিতে আছে।

ভবিষ্যতে কি এই অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? এর উত্তরে আমি বলব, না। আপনার ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি হলেই কেবল আপনি দায় শোধ করতে পারবেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের তুলনায় আয় বাড়ছে না। নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন, বছর বছর আমাদের দেশের সরকারের আয়-ব্যয়ের তফাত একটি ধারা বজায় রেখে যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের ঋণের বোঝা প্রতিবছর জিডিপির তুলনায় চার শতাংশ করে বেড়ে যাচ্ছে। এই একই সময়ে সরকারি সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ৮.৫ শতাংশ এবং রাজস্ব আদায়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ যাচ্ছে সুদে।
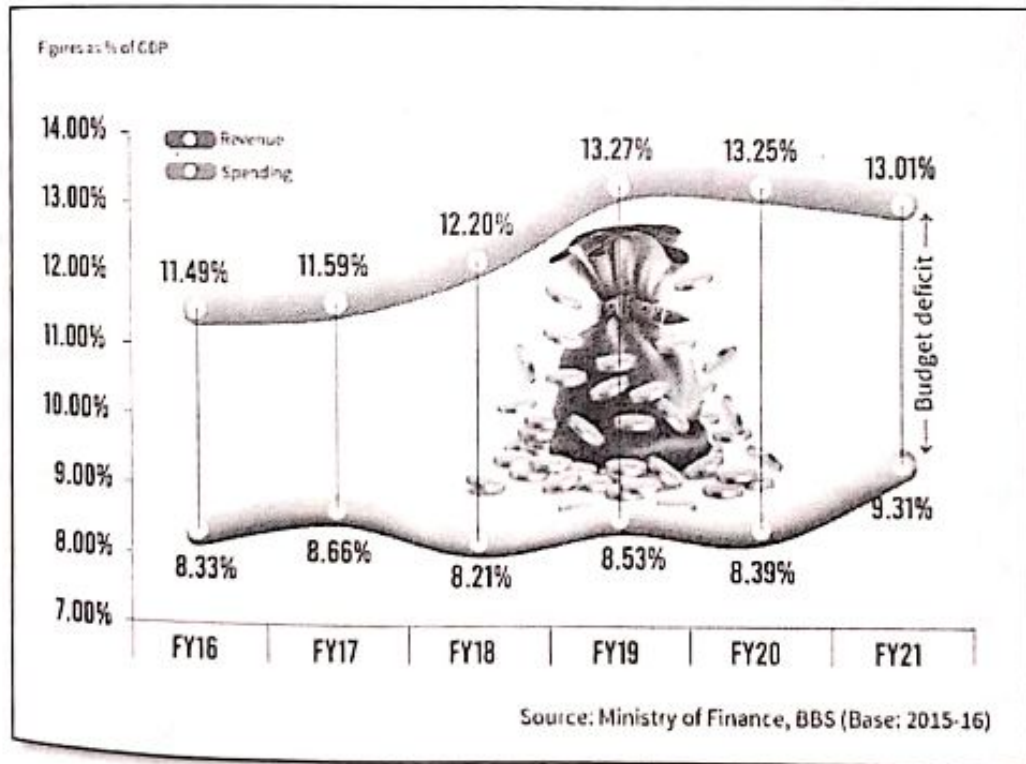
চিত্র– জিডিপির তুলনায় সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়
(সূত্র: বিসনেস স্ট্যান্ডার্ড)

তবে আমাদের জন্য অধিক চিন্তার বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। বাংলাদেশ সরকারের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। সরকার ছাড়া প্রাইভেট কিছু প্রতিষ্ঠানও ডলারে ঋণ নিয়েছে, যা ডলারেই পরিশোধ করতে হবে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালে ২৭.০৫ বিলিয়ন ডলার থেকে গত ১০ বছরে ২৩৮% বেড়েছে! অর্থাৎ ২০২১ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ছিল ৯১.৪৩ বিলিয়ন ডলার! (সূত্র : বিশ্বব্যাংক)।

'ইন্টারন্যাশনাল ডেবট রিপোর্ট ২০২২' শিরোনামের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারতের বৈদেশিক ঋণ একই সময়ে বেড়েছে ৮৩%, পাকিস্তানের বেড়েছে ১০১% এবং শ্রীলঙ্কার ১১৯%। সব মিলিয়ে আমরা বৈদেশিক ঋণের রেড জোনে আছি। (সূত্র : বণিক বার্তা)

এই বই লেখাকালে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ বিলিয়ন ডলার (অফিশিয়াল ফিগার ৩৩ বিলিয়ন ডলার)। অর্থাৎ, আমাদের দেশের রিজার্ভের তুলনায় মোট বৈদেশিক ঋণ প্রায় ৪ গুণ বেশি। চিন্তা করে দেখেন, আপনার মোট সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ চার গুণ বেশি মানে কী? এর মানে হচ্ছে আপনি টেকনিক্যালি দেউলিয়া হয়ে গেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারব?

উত্তর হচ্ছে, আমরা এই অবস্থা থেকে তখনই বের হয়ে আসতে পারব, যখন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের তুলনায় আমরা অধিক আয় করতে পারব। ৭০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের ঘাটতি আগামী ২০ বছরে মেটাতে আমাদের প্রতিবছরে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার বাড়তি আয় করতে হবে সুদের ব্যয় ছাড়া। কিন্তু বাস্তবে বৈদেশিক মুদ্রার ঋণের বিপরীতে সুদের ব্যয় আছে। তবে তার চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে আমরা দিন দিন রিজার্ভ হারাচ্ছি। কেবল এক বছর আগে আমাদের অফিশিয়ালি রিজার্ভ ছিল ৪৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সরকারি তথ্যমতেই গত এক বছরে ১৩ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ আমরা হারিয়েছি। এক কথায় বর্তমানে আমরা কাগজে-কলমে দেউলিয়া হয়ে বসে আছি। কেবল ফলাফল পেতে কিছু সময় বাকি।

> *The multiplication of public offices, increase of expense beyond income, growth and entailment of a public debtare indications soliciting the employment of the pruning knife.*
>
> –Thomas Jefferson

অতিরিক্ত সরকারি অফিস খোলা, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করা এবং ঋণ বৃদ্ধি করে করে দিন পার করা নির্দেশ করে যে আমাদেরকে শীঘ্রই কচুকাটা করা হবে।

—থমাস জেফারসন

তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা জনকদের একজন।

সবশেষে প্রশ্ন আসে, এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী? আমার মতে, খুব দ্রুত তিনটি জিনিস করা যায়। এক. আমদানি পণ্যের মূল্যের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করা, দুই. বিদেশে টাকা পাঠানোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং তিন. অর্থ পাচারের ওপর নজরদারি বাড়ানো।

আমদানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে গণ-অসন্তোষ এবং মূল্যস্ফীতি দেখা দেবে সত্য কিন্তু এই মুহূর্তে বেশি ভালো থাকতে গিয়ে ভবিষ্যতে আরও খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক, তা বাঞ্ছনীয় নয়। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে লেবানন।

সরকার বর্তমানে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে তা হচ্ছে, আমদানি এলসি খোলায় কড়াকড়ি আরোপ করা, সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনের ওপর কড়াকড়ি এবং ডলারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখা। এগুলো বর্তমানে উপকার দিচ্ছে। আশা করি সামনে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, যেমন শিক্ষা ও শিল্প খাতের উন্নয়ন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং রপ্তানি খাতে বিনিয়োগ। আমাদের মনে রাখতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রার অভাববোধ থেকেই আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিয়েছি। এখন যদি আমরা সেই ঋণের সুদের হারের চেয়ে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারি, একদিন দেউলিয়া হয়ে যাব। তাই বৈদেশিক ঋণ নিয়ে রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এমনটা নিশ্চিত করতে না পারলে দেউলিয়াত্ব সুনিশ্চিতরূপে দরজায় কড়া নাড়বে।

সবশেষে আলোচনা করব বিরূপ পরিস্থিতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে ব্যক্তিপর্যায়ে আমাদের কী কী করা উচিত?[২৭]

---

[২৭] অনেকে মনে মনে ভাবতে পারেন, দেশ দেউলিয়া হওয়ার আগেই আমাদের উচিত টাকা বিক্রি করে ডলার বা সোনা কিনে ফেলা। আমি বলব, এই কাজগুলো করলে নিজের কিছু উন্নতি হলেও দেশের অনেক ক্ষতি হবে। কারণ, আমাদের দেশ ডলার বা সোনা তৈরি করে না, তাই এই কাজগুলোর ফলে ডলারের রিজার্ভ শূন্য হয়ে যাবে এবং টাকার পতন ত্বরান্বিত হবে।

দেশকে বাঁচাতে প্রথমে আমাদের উচিত হবে আমদানি নির্ভরশীলতা কমানো এবং যে বিদেশি পণ্যগুলোর দেশীয় বিকল্প আছে, সেগুলো বেশি বেশি ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, কানাডা, আমেরিকাতে বাড়ি কেনা, আফ্রিকাতে ব্যবসা বড় করা কিংবা ভারতে জমি কেনা ইত্যাদি কমাতে হবে। কারণ, এর ফলে দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাবে। তৃতীয়ত, যারা বিদেশে আয়রোজকার করছেন, তাঁদের জন্য উচিত হবে বাংলাদেশে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা। কারণ, দেশ ভালো থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকব। ১৮ কোটি মানুষকে পৃথিবীর কোনো দেশ আদর করে নেবে না। তাই দেশের ভালো করেই নিজেকে ভালো থাকতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

১ দেউলিয়া দেশের টাকার মান কি শূন্য হয়ে যায়?

বাংলাদেশ (বা পৃথিবীর যেকোনো দেশের) সরকার দেউলিয়া হলে অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়বে, তা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। আমাদের অনেকের মাঝে এই ব্যাপারে ভীতি আছে যে সরকার দেউলিয়া হলে টাকার মান শূন্য হয়ে যাবে। ব্যাপারটা অবশ্য তেমন নয়, সরকারের দেউলিয়া হওয়ার সাথে 'কাগুজে' টাকার মান শূন্য হয়ে যাওয়ার তাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই। টাকার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যাংকের। সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় না। তবে বিভিন্ন ব্যাংক যেহেতু সরকারকে ঋণ দিয়ে থাকে, সরকার দেউলিয়া হলে, ব্যাংকগুলোর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং টাকার মান পড়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে টাকার মান বরাবর শূন্য হয়ে যাবে।

২ সরকার দেউলিয়া হলে কি দেশে দুর্ভিক্ষ লাগতে পারে? আমাদের কি শুকনা খাবার সঞ্চয় করে রাখা উচিত?

জার্মানি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একেবারে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, তখনো দুর্ভিক্ষ লাগেনি। এমনকি ভেনেজুয়েলা এবং আর্জেন্টিনাতেও দুর্ভিক্ষ শুরু হয়নি। গ্রিসেও হয়নি। কারণ, কৃষি উৎপাদন ও সরবরাহ বজায় থাকলে দুর্ভিক্ষ হয় না। সরকার দেউলিয়া হলে কৃষিভূমি বা কৃষক গায়েব হয়ে যাবে না। তাই দুর্ভিক্ষের ভয় নেই, ভয় আছে সংকটের। আমরা অনেক খাবার আমদানি করি, যেমন পেঁয়াজ, গম, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি। আবার কৃষি সরঞ্জাম এবং সারের কাঁচামালও আমদানি করি আমরা। সে ক্ষেত্রে খাদ্য ও কাঁচামাল সমস্যা হতে পারে। সার, কীটনাশক, বীজ ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামের

সরবরাহ কমে গেলে কৃষি উৎপাদন কমবে, এটাও একটা বড় সংকট। তবে একেবারে দুর্ভিক্ষ লাগার আশঙ্কা দেখি না, যদি না কোনো বড় পর্যায়ের মিসম্যানেজমেন্ট হয় (যেমন সরকার সার না কিনে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ে সব ডলার খরচ করে ফেলে ইত্যাদি)। আশা করি এত অবিবেচকের মতো কেউ কাজ করবে না এবং খাদ্যে কোনো সমস্যা হবে না।

৩ কেন দেউলিয়া দেশে টাকার মান পড়ে যায়?

টাকার ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে বাজারের অবস্থার ওপরে। মনে করি, দেশের সবার হাতে আজ যে পরিমাণ টাকা ছিল, কাল সেই পরিমাণ টাকাই থাকবে। কিন্তু আজ রাতে সরকার ঘোষণা দিল, 'আমরা দেউলিয়া।' সাথে সাথে মার্কেটে এর প্রভাব পড়বে।

ক্রেতারা হিসাব করে ক্রয় করবে, বিক্রেতা বিনিয়োগ করতে ভয় পাবে, সরকারও ব্যয় বন্ধ করে দেবে এবং বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করে দেবে। সব মিলিয়ে বাজারের রমরমা ভাবটা চলে যাবে। এবার চিন্তা করেন, টাকা যদি ঠিক আগের মতোই থাকে কিন্তু মার্কেট গুটিয়ে আসে, তাহলে কী হবে? উত্তর হচ্ছে, টাকার মান পড়ে যাবে। এবার চিন্তা করুন, টাকার পরিমাণ ঠিক আগের সমানই আছে কিন্তু দেশে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে, বাজারে সবকিছুর সরবরাহ বেশি বেশি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে কী হবে? উত্তর হচ্ছে, টাকার মান বেড়ে যাবে। কারণ, টাকার চাহিদা হবে বেশি কিন্তু সরবরাহ সীমিত। তাই সবকিছুর দাম কমে যাবে।

সরকার দেউলিয়া হওয়ার পরও মানুষ টাকা ব্যবহার করতে পারে; উদাহরণস্বরূপ আর্জেন্টিনা, লেবানন, শ্রীলঙ্কা–সবাই তাদের আগের টাকাই ব্যবহার করছে। তবে সরকার দেউলিয়া হলে টাকার মান কমে যায়, যেহেতু দেউলিয়া দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে আসে।

৪ সরকার দেউলিয়া হলে কি আমরা ব্যাংকের থেকে আমাদের টাকা তুলতে পারব না?

পারব। তবে ব্যাংক যদি নিজেই দেউলিয়া হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। সরকার এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সত্তা। একটি দেউলিয়া হয়ে গেলে আরেকটি দেউলিয়া হবে, এমন কোনো কথা নেই। উদাহরণস্বরূপ

সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলে কি বাজারে বালতির সংকট পড়বে? এই প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর নেই। তবে বালতির সাথে ব্যাংকের পার্থক্য হচ্ছে এই যে ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল খাতের একটি প্রতিষ্ঠান। দেউলিয়া হওয়াও একটি ফাইন্যান্সিয়াল ঘটনা। তাই একটি রাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো যদি সরকারকে ঋণ দিয়ে থাকে, সরকার দেউলিয়া হলে সবগুলো ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। এভাবে রাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল খাত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।

যেকোনো দেশে যেকোনো সময় সকল গ্রাহক একত্রে টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক ভেঙে পড়বে। সুতরাং এটার সাথে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের কোনো আলাদা সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির পরিস্থিতি ভালো থাকলেই যেখানে সবাই ব্যাংক থেকে একত্রে টাকা তুলতে পারবে না, সেখানে অর্থনীতির পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেলে কী হবে, সেটা সবাই বুঝতেই পারছেন।

প্রয়োজনীয় শব্দকোষ

ট্রেজারি বিল

ট্রেজারি বিল হচ্ছে একপ্রকার ঋণের দলিল। সরকার ৪ সপ্তাহ থেকে ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদের ঋণ নিতে ট্রেজারি বিল ছাড়ে। একজন ব্যক্তি (বা ব্যাংক) যখন ট্রেজারি বিল কেনে, তখন সে সরকারকে ঋণ দেয়। যেহেতু এই ঋণে সাধারণত সুদ যুক্ত থাকে, ট্রেজারি বিলের মেয়াদ শেষে সরকার ঋণগ্রহীতাকে সুদে-আসলে বাড়তি টাকা ফেরত দেয়।

সঞ্চয়পত্র

ট্রেজারি বিলের মতো সঞ্চয়পত্রও একপ্রকার ঋণের দলিল। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণের জন্য সরকার সাধারণত যে পত্র ছাড়ে, তা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র বা Treasury bond. সাধারণত এই ঋণের মেয়াদ ১০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হয়। যারা সঞ্চয়পত্র কেনে, তারা সরকারকে ঋণ দেয় এবং সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ শেষে সরকার সবাইকে সুদে-আসলে সব টাকা ফেরত দেয়।

কল মানি মার্কেট

একটি ব্যাংকের হাতে যখন টাকা থাকে না, তখন সে অন্য ব্যাংকের থেকে টাকা চেয়ে ফোন কল দেয়। সাধারণত ব্যাংকিং খাতে মোট টাকার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের হাতে টাকার পরিমাণ কম-বেশি হতে থাকে। এজন্য ব্যাংকগুলো একে অপরের কাছে টাকা চেয়ে কল দিতে থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের মাঝে স্বল্পমেয়াদি ঋণের এই মার্কেটকেই বলে কল মানি মার্কেট।

কল মানি রেট

আন্তব্যাংক ঋণে সুদের হারকে বলে কল মানি রেট। অর্থাৎ কল মানি মার্কেটে যে সুদের হারে ব্যাংকগুলো নিজেদের মাঝে ঋণ আদান-প্রদান করে, তাকে মানি মার্কেট রেট বা কল মানি রেট বলে। সাধারণত এই ঋণগুলো অত্যন্ত নিরাপদ এবং স্বল্পমেয়াদি হয়; তাই সুদের হারও হয় সর্বনিম্ন।

নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট ও ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট

বাংলাদেশের একটি ব্যাংক (ক) যখন আমেরিকার কোনো ব্যাংকে (খ) ডলার ডিপজিট রাখে, তখন তাঁকে বাংলাদেশি ব্যাংকের (ক) নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট বলে। আবার আমেরিকান ব্যাংকের (খ) জন্য এটি ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট। অর্থাৎ আপনার ব্যাংকে যদি বিদেশি ব্যাংক টাকা রাখে, তাহলে তা আপনার জন্য ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট।

> **উদাহরণ:** শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক আমেরিকার জেপি মরগ্যান ব্যাংকে কিছু ডলার সঞ্চিত রাখল। তাহলে শাহ্জালাল ব্যাংকের এমডি পাপন বলবে, 'জেপি মরগ্যানে আমার নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট আছে।' আবার জেপি মরগ্যানের এমডি ডোনাল্ড বলবে, 'আমাদের ব্যাংকে শাহ্জালাল ব্যাংকের ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট আছে।'

ওভার ইনভয়েসিং

ধরুন, আপনি চীন থেকে এক ট্রাক মোবাইল ফোন অর্ডার করেছেন, যার বাজারমূল্য হচ্ছে ২২,০০০ ডলার। কিন্তু আপনি ওই চীনা কোম্পানি বা ব্যবসায়ীকে বলে দিলেন দাম ২৫০০ ডলার দেখাতে। এভাবে আপনি সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ৩০০ ডলার দেশের বাইরে নিয়ে গেলেন। এভাবে বেশি দেখিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা পাচারের প্রক্রিয়াকে বলে ওভার ইনভয়েসিং।

জিডিপি

জিডিপি একটি অঞ্চলের অর্থনীতির আকার নির্দেশ করে। একটি রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এক বছরে যা আয় করে, তা হচ্ছে রাষ্ট্রের মোট বার্ষিক উৎপাদন বা জিডিপি।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো অঞ্চলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে সেই অঞ্চলের জিদিপি প্রবৃদ্ধি বলা হয়।

তীব্র মূল্যস্ফীতি

একটি অর্থনীতিতে সব পণ্য ও সেবার বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াকে মূল্যস্ফীতি বলে। এই মূল্যস্ফীতি যখন তীব্র আকার ধারণ করে (যেমন মাসে ১০০% বা বছরে ১২৯০০%), তখন তাকে তীব্র মূল্যস্ফীতি বা হাইপার ইনফ্লেশন বলে।

মুদ্রাস্ফীতি

কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতি উভয়ই খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ, কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি পেলে মুদ্রার মান পড়ে যায় এবং মূল্যস্ফীতি শুরু হয়। এ ছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিসহ অন্যান্য কারণেও যদি মুদ্রার মান পড়ে যায়, তাহলেও মূল্যস্ফীতি শুরু হয়।

ক্রিপ্টো মুদ্রা

ক্রিপ্টো মুদ্রা হচ্ছে টাকা, ডলার বা পাউন্ডের মতোই কিছু মুদ্রা। তবে অন্যান্য মুদ্রার সাথে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, এগুলো কেবল ডিজিটাল মুদ্রা। টাকাপয়সার মতো এগুলো হাতে হাতে লেনদেন করা যায় না। কেবল অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করা যায়। সাধারণত এগুলোর বিপরীতে কোনো বস্তুগত সম্পদ গচ্ছিত থাকে না (তবে থাকাতেও পারে, সেটা অস্বাভাবিক নয়)। এই মুদ্রাগুলোর সমস্ত লেনদেন ইন্টারনেটে গোপনে হয়ে থাকে, ডিজিটাল ধাঁধা বা এনক্রিপশনের মাধ্যমে। তাই এদের সংক্ষেপে একত্রে ক্রিপ্টো মুদ্রা বলে।

লেখকের অন্যান্য বই

গল্পে গল্পে অর্থনীতি

গল্প হচ্ছে এমনই একটি জাদু, যা কঠিন বিষয়কেও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই অর্থনীতির জটিল পাঠগুলোকে সহজ করে তুলে ধরতে বহুকাল ধরে চলে আসা সেই পদ্ধতিটির অনুসরণ করে 'গল্পে গল্পে অর্থনীতি' বইটি লেখা হয়েছে। এই বইটির অধ্যায়গুলো শুরু হয়েছে 'ঠাকুরমার ঝুলি' কিংবা 'ঈশপের গল্পের' মতো প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়। পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর।

ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

আপনি কি জানেন একফালি কাগজ কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ হলো? অর্থনৈতিক বৈষম্য লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে কেন? আর কেনই-বা উন্নত বিশ্ব এত ঋণগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নগুলো খুব তাত্ত্বিক এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে এগুলো জানা কি আমাদের খুব প্রয়োজন? আসলে প্রশ্নগুলো মোটেও বিচ্ছিন্ন কিংবা তাত্ত্বিক নয়; সম্পূর্ণ জীবনঘনিষ্ঠ এবং একই সুতোয় গাঁথা বাস্তবতা। আমাদের জীবনে নিয়মিত গভীর প্রভাব ফেলা এই না-দেখা বাস্তবতাগুলোকে ছোট ছোট গল্পের আকারে সাজিয়ে সবার কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে রচনা করা হয়েছে এই বই। বইটিতে গ্রন্থকার আমাদের এই না-জানা বাস্তবতাকেই গল্পের মতো প্রাণবন্ত এবং ছবির মতো রঙিন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।
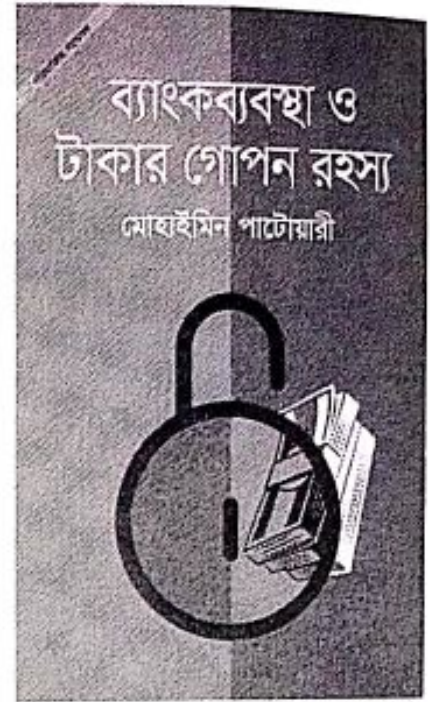
ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি

ইসলামি ব্যাংকিং মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি সংযোজন। নতুন ধারার এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানতে উৎসুক, আবার অনেকেই প্রচণ্ড সন্দিহান। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, এর প্রকৃত স্বরূপ, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এর মিল-অমিল, সীমাবদ্ধতা এবং সমাধান নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

সুদ হারাম, কর্জে হাসানা সমাধান

আপনি কি সুদের পরিচয় জানেন? সুদ দিলে বা নিলে কি ক্ষতি হয়? এত মানুষ সুদে জড়িয়ে পড়ছে কেন? সুদ এত 'উপকারী', তাহলে বাড়ছে কেন 'দারিদ্র্য'?

কর্জে হাসানা কী? কর্জে হাসানা দিলে কি কারও ক্ষতি হয়? কর্জে হাসানা দিলে সমাজ আর সংসারের উন্নতি কীভাবে হয়? কর্জে হাসানা দিলে কি সমাজ সুদমুক্ত হবে? শুধু টাকা দিয়েই কর্জে হাসানা হয়, নাকি সোনা-রুপা-চাল-ডাল দিয়েও হয়? দেশে হাজার কোটি টাকার কর্জে হাসানা ফান্ড থাকলে কী হতো? দুনিয়াতে কি বড় কোনো কর্জে হাসানা ফান্ড আছে? কীভাবে কাজ করে তারা?

উত্তরগুলো বইয়ের ভেতর...

মোহাইমিন পাটোয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'চার্টার্ড ফাইনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট' প্রোগ্রামে যোগ দেন। অর্থনীতি এবং ফাইনান্সের পাশাপাশি গণিতের প্রতিও রয়েছে তার তীব্র ঝোঁক। সিএফএ অধ্যয়নকালেই তিনি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে দ্বিতীয় স্নাতক প্রোগ্রামের ছাত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে ২০১৬ সালে স্নাতক পর্যায়ের গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের সেরা দশে অবস্থান করার পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৭ সালে তিনি সবচেয়ে কম সময়ে (তিন বছরে) সিএফএ কৃতকার্য হন।

গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করার আগেই নরওয়েতে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তার ডাক পড়ে। পরবর্তীকালে 'নরওয়েজিয়ান স্কুল অব ইকনমিক্স' থেকে দ্বৈত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তাকে বৃত্তি প্রদানপূর্বক জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে' পাঠানো হয়। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে দুটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম শেষ করে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি সরল বাংলায় সবার জন্য অর্থনীতির বই লিখে যাচ্ছেন। তার প্রকাশিত চারটি বই– 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য'; 'সুদ হারাম কর্জে হাসানা সমাধান'; 'গল্পে গল্পে অর্থনীতি' এবং 'ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি'–এর প্রত্যেকটি বেস্টসেলার খেতাব অর্জন করেছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, এবং ভাষা শিক্ষার জগতেও তিনি একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০১৮ সালে চাইনিজ ব্রিজ কম্পিটিশনে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানসহ খেলাধুলার জগতে রয়েছে তার একাধিক পুরস্কার। বই লেখার পাশাপাশি সংবাদপত্রেও তিনি কলাম লিখেন। তার সরল ভাষায় এবং গল্পের ভঙ্গিমায় লেখাগুলো ইতোমধ্যেই পাঠকদের মন কেড়েছে।